প্রকাশক :

গ্রীন্ একার বুক্স্

২/১, ডাঃ অক্ষয় পাল রোড

কলিকাতা-৩৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :

প্রসাদ রায়

মুদ্রক :

রূপ-লেখা

২২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,

কলিকাতা-৯।

মা-মণিকে

—লেখক

সূচীপত্র

দ্বৈরথ

সভ্যতার আদিমকাল থেকে মানুষে মানুষে শুরু হয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্ব, কলহ, সংঘাত। কখনো তা এসেছে অধিকার রক্ষার প্রশ্নে, আবার কখনো রাজনৈতিক ক্ষমতালিপ্সাকে চরিতার্থ করার মধ্য দিয়ে। কখনো এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হয়েছে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় পন্থায়—অসিযুদ্ধে, আবার কখনো বা মহাযুদ্ধের বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে। মানুষের এই সংঘাতের কাহিনীকে লিপিবদ্ধ করে রচিত হয়েছে ইতিহাস।

কিন্তু মানুষই এই পৃথিবীর একমাত্র বাসিন্দা নয়। তাই পৃথিবীর এক বিরাট অংশ জুড়ে, জনপদের প্রান্তসীমায় বিস্তৃত রয়েছে যে বিশাল অরণ্য-সাম্রাজ্য, তার অধিবাসীরা সভ্যজগতের কলহ, সংঘাত অথবা রাজনীতির ধার ধারে না। ফলে, এই রাজত্বের নিয়ম-শৃঙ্খলাগুলো চিরন্তন, অপরিবর্তিত। সভ্য জগতের সংশ্রবমুক্ত অরণ্য জগতের অধিবাসীরা জানে শুধু একটি কথা—"হয় মারো, নয় মরো"—শক্তিই এখানে একমাত্র যুক্তি।

আমাদের বর্তমান কাহিনীতে এই উক্তির যথেষ্ট প্রমাণ মিলবে বলেই আমার ধারণা।

ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষে আগত জনৈক শ্বেতাঙ্গ শিকারী মিঃ স্নিকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ভারতের মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত "তক্তুরপানি" নামক পর্বতবেষ্টিত এক অরণ্য অঞ্চল আমাদের কাহিনীর পটভূমি। উক্ত অঞ্চলের অরণ্যভূমি ছিল শ্বাপদসঙ্কুল। এই ধরনের জায়গা সাধারণতঃ কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে খুব আরামপ্রদ এবং নিরাপদে বাসযোগ্য স্থান হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না, ফলে ঐ সময় মিঃ স্নিক যে উক্ত অঞ্চলে নিছক ভ্রমণবিলাস বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার জন্য তাঁবু ফেলেন নি, একথা সহজেই বোঝা যায়।

শ্বেতাঙ্গ শিকারীর নিজের কথাতেই আমাদের কাহিনী শুরু করছি।

"তকতুরপানিতে আমার তাঁবু ফেলার প্রধান কারণ হলো, এই অঞ্চলে সম্প্রতি একটা বাঘ প্রায়ই স্থানীয় গাড়োয়ানদের উপর হানা দিয়ে ফিরছিল এবং ক্রমে সেটা একটা নরখাদকে পরিণত হয়েছিল। অন্যান্য নরখাদক বাঘের মত স্বভাবচরিত্রে এটাও ছিল প্রায় একইরকম এবং অসম্ভব ধূর্ত। আমি নিজে বহুবার জন্তুটাকে "মোষের টোপ" দিয়ে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনবারই সেটা ফাঁদে পা দেয়নি, অসম্ভব বুদ্ধির জোরে মৃত্যুকে এড়িয়ে গেছে। আর আশ্চর্য্য! বাঘটাকে কোনদিনই জোৎস্নারাতে দেখা যেত না। চাঁদের আলোয় সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যেত। সুতরাং ক্রমে ক্রমে আমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেতে লাগলো। শেষ পর্য্যন্ত আমি আর আমার পাঠান সঙ্গী নাদির খান একটা মতলব আঁটলাম।

আমরা জানতাম যে, নিকটবর্তী জলাশয় থেকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি ক্ষীণস্রোতা স্রোতস্বিনী রয়েছে। সুতরাং ঐ জলাশয়ের আশেপাশে কোন জায়গায় অপেক্ষা করলে আমরা নিশ্চিত বাঘটার দেখা পাব, কারণ, জলপান করতে তাকে ঐ জলাশয়ে আসতেই হবে।

আমাদের অভিপ্রায় মতো যখন আমি, নাদির খান এবং মাথু গণ্ড নামে একজন স্থানীয় পথপ্রদর্শক, এই তিনজনে জলাশয়ের পাড়ে এসে পৌছলাম তখন অরণ্যের পশ্চিমপ্রান্তে রক্তসূর্য্যের আভা ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে। পরিবর্তে নেমে আসছে রাত্রির কৃষ্ণ আবরণ। আমরা আশ্রয় নিলাম চারদিক কাঁটাঝোপে ঘেরা ছোট্ট অথচ পরিষ্কার একখণ্ড জমির উপর। আমাদের উন্মুক্ত দৃষ্টিপথে সম্মুখের বিস্তৃত জলাশয়ের পাড় পরিষ্কার দৃশ্যমান। সময় আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল গভীরতর রাত্রির অপেক্ষায়।

রাত প্রায় ন'টা···

জলাশয়ের তীরবর্তী ফাঁকা জমির উপর আত্মপ্রকাশ করলো কয়েকটি সচল ছায়া। একটি—দু'টি—তিনটি—চারটি, চার-চারটি অতিকায় মার্জার। বাবা, মা এবং দু'টি প্রায়-প্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাদের নিয়ে একটি সম্পূর্ণ প্যান্থার পরিবার। দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট তরুণ-বয়স্ক প্যান্থার এবং মা-প্যান্থারের সহযোগে দলটিকে নির্দ্বিধায় বেশ একটু বিপজ্জনক বলেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। উপরন্তু, পরিবারের কর্তা পুরুষ প্যান্থারটি আকৃতিতে ছিল বিশাল। নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় বসে বসে আমরা সেই অতিকায় মার্জার বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছিলাম। হঠাৎ, জলপানে বিরত হয়ে পুরুষ প্যান্থারটি পাড়ের দিকে ঘাড়

ফেরালো। বুঝলাম, আমাদের চোখ ও কানের অগোচরে কোন কিছুর অবস্থিতি তাকে উৎকর্ণ করে তুলেছে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। স্বল্পকালের মধ্যেই একটি ক্ষীণ অথচ দ্রুত খুরের শব্দ আমাদের সজাগ কর্ণেন্দ্রিয়ে আঘাত করলো। খুরের শব্দ ক্রমশঃ স্পষ্টতর হল এবং অবশেষে অরণ্যের অভ্যন্তর থেকে আত্মপ্রকাশ করলো এক বিরাট বন্যবরাহ।

জলাশয়ের পাড়ে একটু দূরেই চার-চারটি চিতাবাঘের মারাত্মক সান্নিধ্য যে তাকে খুব একটা বিচলিত করেছে এমন মনে হোল না, কারণ ফোঁটা-কাটা বিড়ালগুলোর দিকে না তাকিয়েই সে তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ঘোঁৎ! ঘোঁৎ! করতে করতে স্রোতস্বিনীর নিকটবর্তী হয়ে জলপানে মনোনিবেশ করলো।

অন্যদিকে পুরুষ প্যান্থারটার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছিল। রবাহূত হতচ্ছাড়া জানোয়ারটার মতিগতি সম্ভবতঃ তার আত্মসম্মানে ঘা দিয়ে থাকবে। তার সুদীর্ঘ লাঙ্গুল এপাশে ওপাশে আন্দোলিত হয়ে অধীর আক্রোশে আছড়ে পড়ছিল মাটির উপর। যদিও দলগত শক্তির বিচারে বন্যশূকরটা ছিল দুর্বলতর প্রতিদ্বন্দ্বী, তবু প্রাথমিক পর্যায়ের লড়াই-এর কথা চিন্তা করেই পুরুষ প্যান্থারটি বরাহটাকে আক্রমণ করতে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছিল। বরাহটিরও বোধহয় ঐ ছোপওয়ালা বেড়ালগুলোকে ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে সে জলপানে বিরত হয়ে একবার অনতিদূরে দণ্ডায়মান জন্তুগুলোর দিকে মনোযোগ সন্নিবিষ্ট করলো। তারপর বিদ্যুৎগতিতে সোজা তেড়ে গেল গোটা দলটাকে লক্ষ্য করে।

পরিণতি হল আশ্চর্যরকমের হাস্যকর।

বন্যবরাহের তীব্রগতি আক্রমণ এবং তার ওষ্ঠের প্রান্তদেশে শাণিত কিরীচের মত ভয়ংকর দাঁতদুটির সংস্পর্শে এলে তার ফল কি দাঁড়াবে সে সম্পর্কে মার্জার বাহিনীর সম্যক ধারণা ছিল বলেই মনে হল। বন্যপ্রাণীর তীব্র অনুভূতি দিয়ে ততক্ষণে তারা বুঝে নিয়েছে যে এ শিকার সহজ নয়—এর মারাত্মক সান্নিধ্য এড়িয়ে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ফলে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে রণে ভঙ্গ দিল চার-চারটি জানোয়ার। আপদ বিদায় হওয়াতে নিশ্চিন্ত মনে ফিরে এলো বন্যবরাহ। তারপর আবার জলপানে মনোনিবেশ করলো যথারীতি। জলপান শেষ করে এবং জলাশয়ের তীরবর্তী গাছের গায়ে গা ঘসে প্রায় আধঘণ্টা পরে সে ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ করল…

নরখাদক বাঘটির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সামান্য তন্দ্রাভাব এসেছিল মিঃ স্মিলকের।

আচম্বিতে ভয়ংকর এক গর্জনধ্বনিতে কেঁপে উঠলো স্রোতস্বিনীর তীরবর্তী অরণ্যভূমি। মিঃ স্মিলক এবং তাঁর সঙ্গীদের মনে হলো যে বাঘটা বোধহয় ঠিক তাঁদের পিছনেই আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। আবার সেই প্রচণ্ড গর্জনধ্বনি। একবার নয়, পর পর কয়েকবার। তারপর সেই গর্জনের সঙ্গে মিশলো এক বিজাতীয় ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ। ভুল ভাঙলো শিকারীদের, কিন্তু বুঝতে বাকী রইলো না আসল ঘটনা। জলাশয়ের পাড়ে ঝোপের মধ্যে শিকারের জন্য অপেক্ষমান বাঘ মারাত্মক ভুল করেছে—বুদ্ধিভ্রষ্টের মত আক্রমণ করে বসেছে পূর্বোক্ত বন্য শূকরটিকে। মিঃ স্মিলক মনে মনে বেশ খানিকটা পুলকিতই হলেন। বাঘটা যদি তাঁর প্রার্থিত নরখাদকটা হয়ে থাকে তাহলে সে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর পাল্লায় পড়েছে।

অরণ্য জীবনের এই বিরল মুহূর্তগুলো খুব কম ভাগ্যবানের জীবনেই চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা হিসাবে সংগৃহীত হয়, সুতরাং মিঃ স্মিলকের পক্ষেও লোভ সামলানো সম্ভব হল না। ধীরে ধীরে তাঁরা তিনজনই তাঁদের আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে এসে এগিয়ে গেলেন অকুস্থলের দিকে, যেখানে মৃত্যুপণ দ্বৈরথে অবতীর্ণ হয়েছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী—ভারতীয় অরণ্যভূমির দুই মহারথী, কেঁদো বাঘ ও বুনো শূয়োর। খানিকদূর এগিয়েই লড়াইয়ের প্রথম চিহ্নটি চোখে পড়লো। সামনের মাটিতে একখণ্ড সাদা চকচকে বস্তু। পাণ্ডুর চাঁদের আলো বস্তুটির উপর প্রতিফলিত হওয়ার ফলে অন্ধকার রাত্রেও সেটি শিকারীদের দৃষ্টিগোচর হল। মিঃ স্মিলক কৌতূহলী হয়ে বস্তুটিকে তুলে নিলেন—একখণ্ড চর্বি। বরাহের রুক্ষ গাত্রচর্মের সঙ্গে সংলগ্ন চর্বিখণ্ডটি তখনও থিরথির করে কাঁপছিলো।

যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বের ফলাফল।

রক্তের রেখা এইখান থেকে এগিয়ে চলেছে বিক্ষিপ্ত রণক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে। মিঃ স্মিলকের সঙ্গী পথপ্রদর্শক মাথু গণ্ড রক্তের রেখাকে অনুসরণ করে সর্বপ্রথমে অগ্রবর্তী হল। তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন শ্বেতাঙ্গ মিঃ স্মিলক এবং তাঁর পাঠান সঙ্গী নাদির খান। অরণ্য জীবন সম্পর্কে মাথু গণ্ডের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান এবং তীব্র অনুভূতির সাহায্যে সমগ্র ঘটনা অনুমান করতে তার একটুও অসুবিধা হল না—

ক্ষুধার্ত বাঘ যখন শিকারের আশায় এবং জলপান করতে পূর্বোক্ত জলাশয়ের

দিকে আসছিল, তখন বেশ কিছুটা দূর থেকেই জলাশয়ের পাড়ে বন্য বরাহের উপস্থিতি তার তীব্র অনুভূতিতে ধরা পড়ে। ক্ষুধার্ত শ্বাপদ শিকারের অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ কোনো বাঘই একটি পূর্ণবয়স্ক ভারতীয় বুনো শূয়োরকে আক্রমণ করার কথা চিন্তা করে না, কিন্তু যেহেতু এই বাঘটি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল, সেই কারণেই এই ব্যতিক্রমটি ঘটে যায়। শূকরের অবস্থিতি জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘটি ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে এবং জলপান শেষ করে যখনই শূয়োরটি ফেরার পথ ধরে অগ্রসর হয়, তখনই অকস্মাৎ শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘ হয়তো শূকরটিকে একটা গৃহপালিত গরু বা মোষের মতই অনায়াসে নিহত করবে বলে চিন্তা করেছিল, কিন্তু আক্রান্ত বরাহ তার সে চিন্তায় সায় দিল না। ফলে আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে বরাহ তার প্রচণ্ড শক্তিকে প্রয়োগ করে নিজেকে শত্রুর কবলমুক্ত করতে খানিকক্ষণের প্রচেষ্টায় সে সাফল্য লাভ করে এবং পরমুহূর্তে শত্রুর দেহকে সন্ধান করে বারবার শূন্যে আন্দোলিত হয় বরাহের দু'টি শাণিত কিরীচ। ভয়ংকর দাঁতদুটোর মারাত্মক সান্নিধ্যে এসে, বাঘ কিছুক্ষণের মধ্যেই উপলব্ধি করে নিজের নির্বুদ্ধিতার গুরুত্ব, কিন্তু জঙ্গলের আইনে প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ খুব কমই পাওয়া যায়। ফলে বরাহের দন্তাঘাতে সাংঘাতিকভাবে আহত বাঘ যখন রণভূমি ছেড়ে পশ্চাদপসরণ করে তখন তার অন্তিম সময় নিকটবর্তী। কিন্তু "বেড়ালের ন'টি প্রাণ"। সুতরাং সেই অতিকায় মার্জার মরণাহত হয়েও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে নি। আরও কয়েকবার দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর টুকরো টুকরো সংঘাতে রণক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে। গাছের গায়ে, ঝোপে-ঝাড়ে ইতস্ততঃ চোখে পড়লো টুকরো টুকরো ঝুলে থাকা হলুদ কালো পশমী গাত্রচর্মের ফালি। আর একটু এগোতেই দ্বৈরথ যুদ্ধের অন্যতম নায়কের দেখা মিললো। শাণিত কিরীচের মত দাঁতের নিষ্ঠুর সঞ্চালনে ছিন্ন-ভিন্ন নরখাদকের মৃতদেহ। শুধুমাত্র করোটি এবং পায়ের নখগুলি ছাড়া দেহে আর কিছুই প্রায় অক্ষত নেই। মিঃ স্মিলক সেই অক্ষত অংশগুলিই সংগ্রহ করলেন এই দুর্লভ দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে।

এরপর বরাহের সন্ধান।

রক্তের ঘনত্ব, বর্ণ এবং পরিমাণে বোঝা গেল যে বরাহের অবস্থাও খুব একটা ভাল কিছু নয়। সেও সাংঘাতিকভাবে আহত।

মিঃ স্মিলক এবং তাঁর সঙ্গীরা আশা করলেন যে বাঘের

মৃতদেহের খুব কাছাকাছিই শূয়োরের সন্ধান মিলবে। অবশ্যই মৃত অবস্থায়।

কিন্তু আশ্চর্য্য শক্তির অধিকারী ঐ বুনো শূয়োর।

ঘন রক্তের চিহ্ন ধরে শিকারী দল যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর শূকরটিকে একটি জলাশয়ের পাড়ে আবিষ্কার করলেন, তখন মূল রণক্ষেত্র ছাড়িয়ে তাঁরা পাক্কা ছ-ছ'টি মাইল অতিক্রম করে এসেছেন।

শূকরটির অন্তিম যন্ত্রণা শিকারীদের কারুরই সহ্য হচ্ছিল না। ফলে মিঃ স্মিথকের রাইফেল অগ্নিবর্ষণ করে বন্যবরাহকে তার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিল।

অগ্নিপরীক্ষা

উত্তর রোডেশিয়ার লিভিংস্টোন নামক অঞ্চলটিতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে যে পুলিশ কর্মচারীটি নিয়োজিত হয়েছিলেন, তাঁর নাম মিঃ জ্যাকোয়েস্ট। কিন্তু স্থানীয় অঞ্চলের শান্তিরক্ষার কাজে ব্যাপৃত হয়ে, মাত্র দিনকয়েকের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করলেন যে, এইসব জায়গায় যে মানুষগুলো শান্তি ভঙ্গ করে তারা স্বভাবতঃই খুব শান্তশিষ্ট, ভদ্র এবং বিনীত চরিত্রের নয়। এইসব দুর্বিনীত মানুষদের শায়েস্তা করতে গিয়ে দণ্ডদাতাকেও মাঝে-মধ্যে বেশ খেসারত দিতে হয়। এমনকি, পুলিশ নামক আইনরক্ষাকারী জীবদেরও এরা যে সবসময়ে খুব রেয়াত করে চলে একথা বললে সত্যি কথা বলা হয় না। বিপদে পড়লে তারা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পুলিশ কর্মচারীর উপর তাদের অভ্যস্ত হাতের প্রচণ্ড মুষ্টিযোগ অথবা হস্তধৃত অস্ত্র প্রয়োগ করতে দ্বিধা বোধ করে না।

একটি ছোটখাট ঝামেলার মধ্যে দিয়ে মুখের সামনের দিকের চার-চারটি দাঁত খুইয়ে এই কথা ক'টি জ্যাকোয়েস্ট অচিরে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলেন।

কথায় বলে—'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না'; জ্যাকোয়েস্টের ক্ষেত্রে প্রবচনটা অক্ষরে অক্ষরে ফলল। ডাক্তার নকল দাঁতের পাটি জুড়ে দিয়ে জ্যাকোয়েস্টের মুখের পুরোনো আদল ফিরিয়ে দিল বটে; কিন্তু নকল দাঁতের উপসর্গ নিয়ে বেচারা পুলিশ কর্মচারীটি পড়ল খুবই অস্বস্তিতে। চিবোতে গেলে বিপত্তি, হাঁ করতে গেলে বিপত্তি, আর খাওয়ার কথা মনে হলেই তার গায়ে জ্বর আসতে লাগল।

কিন্তু দাঁতের চিন্তা করলে তো আর দাঁত ফিরে আসবে না। সুতরাং সে চিন্তায় ইস্তফা দিয়ে জ্যাকোয়েস্ট ছুটলেন তাঁর কার্যক্ষেত্রে। শান্তিভঙ্গকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় দণ্ডবিধান করতে—পুলিশ কর্মচারী হিসাবে এটা তাঁর কর্তব্য।

পুলিশ স্টেশনে ঢোকার মুখে কয়েকজন স্থানীয় লোক দল বেঁধে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। প্রতিদিনের মত আজও তারা জ্যাকোয়েস্টকে অভিবাদন
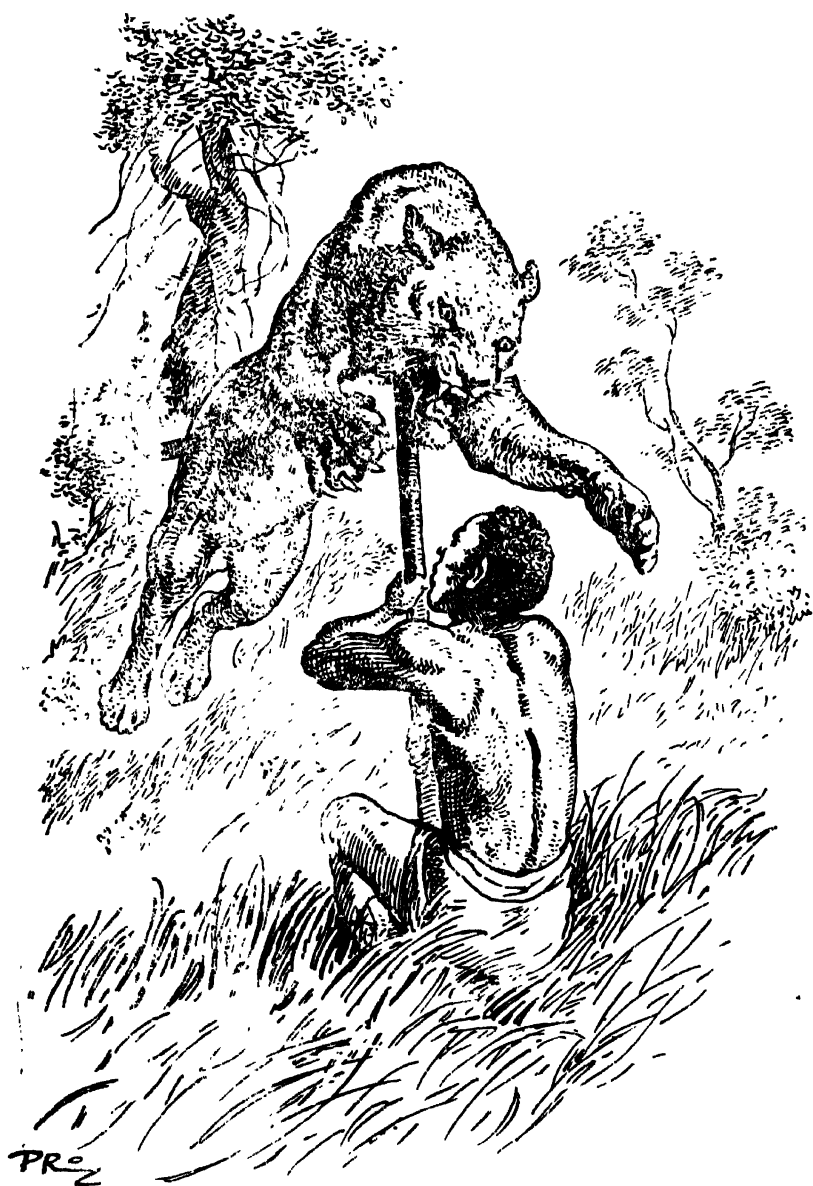
জানাল—'ম্যাতিন্দে ম্'কোয়ে'। বাংলায় তর্জমা করলে যার অর্থ দাঁড়ায়—'হে মহান ব্যক্তি! আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন।'

পুলিশ কর্মচারী হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে স্থানীয় অধিবাসীদের এই সুন্দর অভিবাদনটি জ্যাকোয়েস্টের খুব প্রিয় ছিল। গোটা উত্তর রোডেশিয়া জুড়ে বহু জায়গায় তিনি এই কথাদু'টি শুনেছেন, কিন্তু কোনদিনই তাঁর পুরোণো মনে হয়নি।

স্থানীয় লোকেদের সমস্যার সমাধান করতে হলে আগে সেগুলো জানা প্রয়োজন। দোভাষীকে ডেকে পাঠালেন জ্যাকোয়েস্ট। দোভাষী এল, কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জ্যাকোয়েস্ট প্রথমেই অপ্রস্তুত হলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কোন পরিষ্কার কথা নির্গত হল না--কেবল কয়েকটি অস্ফুট শব্দ। সন্দেহ নেই যে ঐ ধ্বনিবিকৃতির কারণ—নকল দাঁতের পাটি। সুতরাং, উপায়ান্তর না দেখে, মুখগহ্বর থেকে কৃত্রিম দন্তপংক্তি অপসারিত করে পুনরায় বাক্যালাপ করতে সচেষ্ট হলেন জ্যাকোয়েস্ট। তাঁর এই অদ্ভুত কার্যকলাপ এবং মুখমণ্ডলের আকস্মিক বিকৃতি অপেক্ষমান স্থানীয় অধিবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে। ফলে তাদের মধ্যে একটা সমবেত হাসির রোল পড়ে গেল। জ্যাকোয়েস্ট তাকিয়ে দেখলেন, হাসতে হাসতে তারা একে অপরের গায়ে লুটিয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি হাস্যকর বটে, কিন্তু জ্যাকোয়েস্টের মনে হল স্থানীয় লোকগুলো তাঁকে নিয়ে যেন একটু বাড়াবাড়ি ধরনের রঙ্গ-রসিকতা শুরু করেছে। একজন ক্ষমতাশালী পুলিশ কর্মচারীর কাছে এ ধরনের বেয়াদবি অসহ্য। দাঁতের পাটি মুখে পুরে নিয়ে রাগে লাল হয়ে তিনি উঠে গেলেন পাশের ঘরে।

জ্যাকোয়েস্টের ঘরের পাশের ঘরটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লসনের কার্যালয়। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লসনের বয়স হয়েছে। মাথার চুলে সাদা পাক ধরেছে। উত্তর রোডেশিয়া পুলিশ বাহিনীর একজন অভিজ্ঞ কর্মচারী তিনি। কর্মরত সময়ে বহুদিন ধরে স্থানীয় অঞ্চল এবং অধিবাসীদের সংস্পর্শে থাকার ফলে তাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতি তাঁর নখদর্পনে।

ক্ষিপ্ত জ্যাকোয়েস্টের সমস্ত অভিযোগ মন দিয়ে শুনলেন তিনি। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে অভিযোগকারীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন —"আচ্ছা, লোকগুলো যখন তোমার দিকে চেয়ে হাসতে শুরু করল, তার আগে তারা কিছু বলাবলি করছিল বলে তোমার মনে পড়ে?"

চিন্তায় পড়লেন জ্যাকোয়েস্ট। প্রথমতঃ, স্থানীয় ভাষা তিনি বোঝেন না,

ফলে তাদের উচ্চারিত শব্দের অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কোন উপায়েই তাঁর পক্ষে লসনকে সাহায্য করা সম্ভব নয়; দ্বিতীয়তঃ, তাঁর এখন মাথা গরম, স্থির হয়ে কিছু চিন্তা করা তাঁরপক্ষে কঠিন। তবু অল্প-সল্প কিছু মনে পড়ল জ্যাকোয়েস্টের—"হ্যাঁ! কি যেন 'বা-ইলা' বা ঐ ধরনের কোন শব্দ তারা উচ্চারণ করছিল বটে।"

চোখদুটো চিক্‌চিক্ করে উঠল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট লসনের, ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল মৃদু হাসির রেখা,—'ঐ জন্যে, তাই বল!'

তারপর একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন তিনি,—

'বুঝলে! এখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা খুব সরল বা সাদাসিদে। সামান্য মজার ব্যাপার হলেও এরা সেটাকে চূড়ান্তভাবে উপভোগ করে। আর সবচেয়ে মজা হয় যখন সেই আমোদের কারণ ঘটায় কোন শ্বেতাঙ্গ।'

'কিন্তু আসল মজাটা যে কি তা তো বুঝলাম না।' জ্যাকোয়েস্ট বেশ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত।

সরাসরি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে প্রৌঢ় সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এগিয়ে গেলেন ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো বড় মানচিত্রটার দিকে। মানচিত্রটা স্থানীয় অঞ্চলসমূহকে নির্দেশ করে অঙ্কিত।

'দেখ! এই যে জায়গাটা দেখছ', লসনের আঙুল মানচিত্রের উপর একটি বড় ভূখণ্ডকে নির্দিষ্ট করে, "এই জায়গাটার নাম 'বারোৎসে অঞ্চল', আমরা বলি 'সিংহের দেশ'। আর এই অঞ্চল জুড়ে বাস করে একদল বিচিত্র মানুষ—'বা-ইলা' উপজাতি। কিন্তু এই উপজাতিটির সম্বন্ধে কিছু জানবার আগে প্রথমে ঐ 'বারোৎসে অঞ্চল'-এর একটা সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ তোমার জানা প্রয়োজন।"

"জাম্বেসী নদীর প্রবল বন্যায় বছরের মধ্যে একটা সময় এই অঞ্চলটির দুই-তৃতীয়াংশ প্লাবিত হয়। সেই সময়ে বন্যার জলে তাড়িত হয়ে 'বারোৎসে অঞ্চলের' সমস্ত প্রাণী আশ্রয় গ্রহণ করে পাহাড়ী উচ্চভূমির উপর। তারপর বেশ কিছুদিন পরে জল সরে যায়—বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আত্মপ্রকাশ করে পলিমাটি সমৃদ্ধ উর্বর ভূভাগ—'বারোৎসে সমভূমি'। উর্বর জমির বুকে দ্রুত দেখা দেয় সবুজের সমারোহ, আফ্রিকার তৃণভূমির নিবিড় স্নিগ্ধ শ্যামলিমা। পাহাড়ের উপর থেকে দলে দলে পশুরা নেমে আসে সমতলভূমির বুকে। তৃণভোজী প্রাণীদের খোঁজে তখন উপত্যকার বুকে এসে হাজির হয় সিংহের পাল। ফলে, এই সময়

পশুরাজের আক্রমণ থেকে নিজেদের গৃহপালিত পশুদের রক্ষা করতে প্রায়ই সমভূমির অধিবাসীদের যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয় সিংহের বিরুদ্ধে।

বিস্তীর্ণ এই স্থানীয় অঞ্চল জুড়ে বাস করে তিয়াত্তরটি উপজাতি। কিন্তু অন্যান্য বাহাত্তরটি উপজাতির তুলনায় 'বা-ইলা'-রা এক বিরাট ব্যতিক্রম। দুর্জয় সাহসী এবং একগুঁয়ে প্রকৃতির এই উপজাতিটি স্বভাব-চরিত্রে একেবারেই স্বতন্ত্র।

'বা-ইলা'-দের পূর্বকথা আমরা প্রায় কিছুই জানি না। আর খুব অল্পসংখ্যক 'বা-ইলা'-কেই আমরা উত্তর রোডেশিয়ার পুলিশ বাহিনীতে নিযুক্ত করে থাকি। তার কারণ প্রধানতঃ দু'টি। প্রথমতঃ এদের একগুঁয়েমী, আর দ্বিতীয়তঃ এদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ। শ্বেতাঙ্গদের নিয়মকানুন এদের একেবারেই অপছন্দ।" একটু থামলেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

নড়ে চড়ে বসলেন জ্যাকোয়েস্ট। নকল দাঁতের পাটি মুখ থেকে খুলে নিয়ে ততক্ষণে তিনি পকেটে পুরেছেন। যদিও ওই দাঁতের পাটির সঙ্গে 'বা-ইলা' উপজাতির কি সম্পর্ক থাকতে পারে সেকথা তখনও তাঁর মাথায় ঢোকেনি।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লসন আবার শুরু করলেন,—"কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করার বয়ঃসন্ধিকালে বা-ইলা যুবকদের এক ভয়ংকর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। নিজের পৌরুষ প্রমাণ করার জন্য একাকী তাকে একটি সিংহের সম্মুখীন হতে হয়, এবং কেবলমাত্র একটি বল্লমাকৃতির বংশদণ্ডের সাহায্যে ঐ সিংহটিকে শিকার করতে হয়। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বা-ইলা যুবকের মুখের সামনের দিকের দাঁত ভেঙে দেওয়া হয়। এটি তার কষ্টসহিষ্ণুতার পরীক্ষা এবং সিংহজয়ী পুরুষের প্রতীকচিহ্ন। ঐ চিহ্ন তাকে বালক এবং কিশোরদের থেকে আলাদা করে দেয়।

তুমি ঐ 'বা-ইলা'-দের অনুকরণ করেছ মনে করেই স্থানীয় অধিবাসীরা তোমাকে দেখে হেসেছে।"

জ্যাকোয়েস্ট স্বস্তি পেলেন। বুঝেসুঝে বোকা হওয়া খুবই অস্বস্তির ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু না বুঝে বোকা সাজা তো রীতিমতো শাস্তি।

তখনকার মত আশ্বস্ত হলেও, লসনের কথাগুলো জ্যাকোয়েস্টের মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। সিংহবিক্রম 'বা-ইলা'-দের দেখবার প্রবল ইচ্ছা তাঁকে পেয়ে বসল।

সুযোগও এসে গেল মাসকয়েক বাদে...

পুলিশের প্রথামত অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লসন দায়িত্ব দিলেন জ্যাকোয়েস্টের উপর। জ্যাকোয়েস্টের কৌতূহলের কথা তাঁর মনে ছিল। সঙ্গে দেওয়া হল একজন সার্জেণ্ট ও ছ'টি কনস্টেবল। সার্জেণ্টটি স্থানীয় অধিবাসী। ফলে 'গাইড' হিসাবেও মন্দ নয়।

যাত্রাপথে মূল পরিবহন নৌকা, সুতরাং ভাড়া করা ছাড়া উপায় নেই। স্থানীয় অধিবাসীরা 'ম্যুকোয়া' গাছের কাঠ দিয়ে বিশেষ একধরনের নৌকা প্রস্তুত করে। তারই একটা ভাড়া করে ছোট দলটির যাত্রা শুরু হল জাম্বেসীর বুকে। বিস্তৃত নদী জাম্বেসী। একবার নৌকা উল্টে গেলে নদীবক্ষে দলে দলে বিচরণশীল নক্রকুল অথবা জলহস্তীর জলযোগে পরিণত হওয়াও আশ্চর্য নয়...

নদীপথে গন্তব্যস্থান ছিল 'মংগু' নামক একটি ছোট শহরতলী। অতঃপর স্থলপথে 'ম্যাংকোয়া' পর্য্যন্ত।

যাত্রাপথ মোটামুটি নির্বিঘ্নেই কাটল। পাঁচদিনের জলবিহার শেষে জ্যাকোয়েস্ট তাঁর দলবল নিয়ে এসে পৌছলেন 'মংগু'-তে।

ছোট শহরটির শাসনকার্য পরিচালনা করেন জনৈক ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার। জ্যাকোয়েস্ট তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার মিঃ সিম্পসন নিঃসন্দেহে যোগ্য ব্যক্তি। ভদ্রলোক যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং তাঁর আওতায় গোটা অঞ্চলটি সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। এছাড়া জনৈক ডাক্তার এবং কয়েকজন সরকারী কর্মচারীর দেখা পেলেন জ্যাকোয়েস্ট। স্থানীয় পসারীদের মধ্যে অধিকাংশই গ্রীস্‌দেশীয় অথবা ভারতীয়।

সরকারী অতিথিশালায় থাকার বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু মিঃ সিম্পসনের আমন্ত্রণে তাঁর বাড়ীতেই আতিথ্য গ্রহণ করলেন জ্যাকোয়েস্ট।

ঐদিন বিকেলে কথায় কথায় স্থানীয় অধিবাসীদের প্রসঙ্গ উঠল। জ্যাকোয়েস্ট তাঁর কৃত্রিম দন্তপংক্তির ইতিহাস বিবৃত করতে গিয়ে, সিম্পসনকে তাঁর কৌতূহল এবং আগ্রহের কথাও জানালেন। প্রত্যুত্তরে মিঃ সিম্পসন যে প্রস্তাব রাখলেন সেটি চমকপ্রদ—

মাইল ত্রিশেক দূরের একটা 'বা-ইলা' গ্রামে জনৈক মোড়লের ছেলে বয়ঃসন্ধিতে উত্তীর্ণ হয়েছে, এবং এই সময়টি যেহেতু পশুরাজের মিলনকাল বা **mating season,** সেই কারণে ঐ বিশেষ উৎসবটি অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে সুবর্ণ সময়। জ্যাকোয়েস্ট ইচ্ছা করলে, তিনি তাঁকে উক্ত অনুষ্ঠানটি দেখবার জন্য ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

এ যেন 'মেঘ না চাইতে জল পাওয়া'। তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন জ্যাকোয়েস্ট।

পরদিন প্রত্যুষে আফ্রিকান সার্জেণ্টটিকে সঙ্গে নিয়ে ট্রাকে চড়ে পূর্বে উল্লিখিত 'বা-ইলা' গ্রামটির দিকে যাত্রা করলেন তিনি। সার্জেণ্টটি স্থানীয়, ফলে দোভাষীর কাজ দেবে। উপরন্তু, মিঃ সিম্পসন যে ট্রাকচালকটিকে সঙ্গে দিয়েছিলেন, পথপ্রদর্শকের কাজও সে বেশ ভালমত চালাতে সক্ষম।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে কিন্তু প্রথমে বেশ কিছুটা অবাক হলেন জ্যাকোয়েস্ট। গ্রামের মধ্যে একটিও পুরুষের চিহ্ন নেই। কেবল স্ত্রীলোকেরা দুপুরের খাবার তৈরী করতে ব্যস্ত। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে কতগুলো উচ্ছিষ্ট-লোভী কুকুর। আর কোন প্রাণের সাড়া চোখে পড়ে না।

জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল যে গ্রামের সমস্ত পুরুষ ও যুবকরা জঙ্গলে গেছে সিংহের খোঁজ করতে, ফলে গ্রামে এখন কেউ নেই। তবে 'বাওয়ানা' (সাহেব) যদি অপেক্ষা করেন তাহলে দুপুরেই তাদের সঙ্গে দেখা হতে পারে।

দেখতেই এসেছেন জ্যাকোয়েস্ট, ফলে তিনি বিশ্রামের উদ্‌যোগ করলেন।

বেলা যত বাড়তে লাগল, ছোট ছোট দল বেঁধে কিশোর অথবা যুবকরা গ্রামে ফিরতে শুরু করল। বিকেল পড়তে পড়তে প্রায় সবাই গ্রামে ফিরে এল।

গ্রামের মোড়লের ছেলে 'চুলা'। তাকে ডেকে পাঠালেন জ্যাকোয়েস্ট। সে এল। হ্যাঁ! জরীপ করার মতই একখানা চেহারা বটে! তার আপাদমস্তকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন জ্যাকোয়েস্ট। উদ্ধত, বলিষ্ঠ 'বা-ইলা' যুবক। উন্নত ললাটের নীচে একজোড়া চোখের দৃষ্টি শীতল। মুখের আদল মোটেই প্রতিবেশী উপজাতিদের সদৃশ নয়—পাথর কেটে খোদাই করা মুখাবয়বের সঙ্গে আরব-দেশীয়দের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বর্তমান। বলিষ্ঠ দেহ জুলু যোদ্ধাদের মত ছিপছিপে। তার কাছে জ্যাকোয়েস্ট জানতে পারলেন যে আজ সারাটা দিন খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে একটি সিংহীর দেখা পাওয়া গেছে। গ্রাম থেকে অদূরবর্তী একটা জলাশয়ের ধারে একটা জেব্রা শিকার করে নিয়ে এসে সে আস্তানা গেড়েছে। খাদ্য এবং জলের প্রাচুর্য্য থাকায় সে অন্ততঃ দিনদুই ঐ আস্তানা গোটাবে বলে মনে হয় না। সুতরাং, পরদিন উষাকালেই 'চুলা' ঐ সিংহীটার মুখোমুখি হবে।

সেদিন সারারাত আশেপাশের গ্রাম থেকে ক্রমাগত দলে দলে লোক এসে

জমায়েত হতে লাগল পূর্বোক্ত গ্রামটিতে। সারারাত ধরে মশালের আলোয় চলল অবিরাম মদ্যপান। বহুচেষ্টা করেও জ্যাকোয়েস্ট দু'চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। গ্রামের অধিবাসীদের উত্তেজনা তাঁকেও স্পর্শ করেছিল।

জ্যাকোয়েস্টের ঘড়িতে তখন ভোর চারটে।

পথপ্রদর্শক এসে জানাল সময় হয়ে গেছে। তৈরীই ছিলেন জ্যাকোয়েস্ট। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে গাইডের অনুসরণ করলেন। গ্রামের মধ্যে থেকে এক জনস্রোত এগিয়ে চলেছে অরণ্যের পথে। তাদের সঙ্গে, প্রায় পাঁচফুট লম্বা একটা বাঁশ হাতে চলেছে এক অপরূপ মূর্ত্তি—'চুলা'।

বেশ কিছুটা পথ চলার পর এক বিরাট উইঢিপির সামনে এনে জ্যাকোয়েস্টকে দাঁড় করাল পথপ্রদর্শকটি। পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত স্থান। উইঢিপিটার উপর থেকে অগ্রবর্তী সবকিছুই সহজে দৃষ্টিগোচর হবে। ধীরে ধীরে জ্যাকোয়েস্ট ঢিপিটার উপরে উঠে পড়লেন। আফ্রিকার সমতলভূমি তখনও নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক উইঢিপির উপর দাঁড়িয়ে আছেন জ্যাকোয়েস্ট...

প্রথম উষার আলো ধীরে ধীরে ফুটে উঠল দিগন্ত জুড়ে। সাদা-কালোর আঁচড়ে ফুটে উঠতে লাগল বিভিন্ন দৃশ্যপট। সম্মুখের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, ইতস্ততঃ ছড়ানো দু'চারটে গাছ, উঁচু উইঢিপি। নীচে দৃষ্টিপাত করলেন জ্যাকোয়েস্ট।

বিস্তীর্ণ তৃণভূমির উপর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে এক চলন্ত বৃত্ত—'বা-ইলা' যোদ্ধাদের সারি। প্রায় দু'শ গজ ব্যাসযুক্ত সেই বৃত্তের মধ্যস্থলে একটি ঝোপ জ্যাকোয়েস্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ঝোপের আড়ালে শায়িত একটি ধূসর দেহ। এতদূর থেকেও জ্যাকোয়েস্টের পক্ষে বস্তুটির স্বরূপ উপলব্ধি করতে বিলম্ব হল না—ঘুমন্ত সিংহী!

ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে এল বৃত্তাকারে সারিবদ্ধ যোদ্ধার দল! নিস্তব্ধ, নীরব তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের বুকে শুধু মন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে চলেছে একদল মানুষ।

ঘুমন্ত সিংহীকে কেন্দ্র করে ক্রমশঃ ছোট, আরও ছোট হয়ে এল বেষ্টনী। তারপর হঠাৎ প্রত্যুষের শান্ত নীরবতাকে খান্ খান্ করে দিয়ে প্রান্তরের বুকে জেগে উঠল সহস্র উন্মত্তকণ্ঠের বীভৎস ঐকতান। যেন এক অদৃশ্য জাদুমন্ত্রে প্রতিটি 'বা-ইলা' যুবকের রক্তে জেগে উঠেছে বন্য হিংসা, দেহের প্রতিটি স্নায়ু-তন্ত্রীতে জেগেছে হত্যার উন্মাদনা। টিনের ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বিকট চীৎকার

করতে করতে তারা এগিয়ে চললো সিংহীটার দিকে। জ্যাকোয়েস্টের মনে হলো তার সামনে নরকের সবকটা দরজা যেন কেউ একমুহূর্তে খুলে দিয়েছে…

ঝোপের আড়ালে উঠে দাঁড়াল ক্রুদ্ধা সিংহী। নিদ্রাভঙ্গের বিরক্তি এবং আক্রমণের আকস্মিক ধাক্কায় সে খানিকটা বিচলিত। আন্দোলিত সুদীর্ঘ লাঙ্গুল, ত্রস্তদৃষ্টি, অভিব্যক্তিতে ভয় এবং ঘৃণার ভাব পরিস্ফুট।

শ্বাপদের মতো ঋজু পদক্ষেপে চুলা প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হল। তার দৃঢ়মুষ্টিতে বল্লমের মত সুতীক্ষ্ণ বংশদণ্ড শক্ত করে ধরা। দু'চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শত্রুর গতিবিধির উপর সতর্ক পরীক্ষায় নিবদ্ধ। সিংহীও ততক্ষণে তার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বীকে আবিষ্কার করে ফেলেছে—তার শীতল, ধূসর দু'টি চোখ আর ত্রস্ত নিরীক্ষণে ব্যস্ত নয়, চুলার উপর স্থির। সম্মুখ দ্বৈরথের জন্য প্রস্তুত হল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী—

হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে থেমে গেল সমস্ত কোলাহল। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, প্রান্তরের বুকে পুনরায় বিরাজ করতে লাগল স্তব্ধতার রাজত্ব।

প্রতিটি মুহূর্ত এক একটা যুগ বলে মনে হচ্ছে জ্যাকোয়েস্টের। নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছেন তিনি। অজানিত আশংকা নিয়ে এ এক আশ্চর্য্য প্রতীক্ষা…

ধীরে ধীরে সতর্কপায়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে এগিয়ে এল চুলা, দু'জনের মধ্যে দূরত্ব হবে আর বড়জোর পনেরো ফুট! চুলার দু'হাতে শক্ত করে ধরা ছুঁচোলো বাঁশের দণ্ডটি শত্রুর দিকে আনত…

সিংহীর উন্মুক্ত ওষ্ঠের ফাঁকে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করল তীক্ষ্ণ দন্তের সারি, কণ্ঠদেশ থেকে নির্গত হল অবরুদ্ধ গর্জনধ্বনি। তার প্রকাণ্ড শরীরের সমস্ত মাংসপেশীগুলো সংকুচিত হয়ে এল। আক্রমণের পূর্বসংকেত!

চুলার ছিপছিপে বলিষ্ঠ দেহ ধনুকের মত বেঁকে গেল চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায়।

মুহূর্তের অপেক্ষা…

তারপরই প্রচণ্ড গর্জনে বনভূমি প্রকম্পিত করে সিংহী লাফ দিল। একটা ধূসর বিদ্যুৎ উড়ে এল চুলার দিকে।

এক ইঞ্চি নড়ল না 'বা-ইলা' যুবক।

জ্যাকোয়েস্টের মনে হল চুলার হাতের 'অস্ত্রের' নাগাল এড়িয়ে সিংহী তার প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর এসে পড়েছে—আর মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে নখ ও দাঁতের ক্ষিপ্র সঞ্চালনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে হতভাগ্য বা-ইলা যুবকটির দেহ।

কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরী হল না।

দু'হাতের প্রাণপণ শক্তিতে চুন্না তখন বাঁশটাকে ধরে রেখেছে মাটিতে ঠেস দিয়ে। আর তার মাথার উপর বাঁশের ছুঁচোলো ফলায় বিদ্ধ হয়েছে সিংহীর কণ্ঠদেশ।

কৌশল, শক্তি এবং বুদ্ধির জোরে চুন্না উত্তীর্ণ হয়েছে তার যৌবনের অগ্নি পরীক্ষায়।

হরিণ নিরীহ নয়

সৌন্দর্য্যের প্রতীক হরিণ। যুগ যুগ ধরে কবির সৃষ্টিতে, লেখনীতে, কাব্যে হরিণের উল্লেখ ঘটেছে রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক উপমা হিসাবে। তপোবনের যুগ থেকে আজও হরিণ মানুষের প্রিয় পোষ্য।

স্বভাব চরিত্রের দিক দিয়ে হরিণ নিতান্তই নিরীহ, ভীতসন্ত্রস্ত প্রাণী। অরণ্যে, শিং, দাঁত এবং নখের রাজত্বে, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এই প্রাণীটির সম্বল শুধুই গতি, সুতরাং পালিয়ে বাঁচা ছাড়া নিজেকে রক্ষা করার দ্বিতীয় কোন অস্ত্র হরিণের একরকম নেই বললেই চলে। কিন্তু এগুলো হল সাধারণ নিয়মের কথা। শহরের বুকে চিড়িয়াখানার আবদ্ধ গণ্ডি পেরিয়ে অরণ্য সাম্রাজ্যের মুক্ত পটভূমিতে যেখানে নিয়মের রাজত্বে মাঝে মাঝেই ব্যতিক্রমের দেখা মেলে, সেখানে আমাদের পূর্বোক্ত কথাগুলো হয়ত বহুক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়। নীচে আমি সেরকম দুটি ঘটনার বিবরণী পেশ করলাম। লক্ষ্যণীয় বিষয়, উক্ত কাহিনীকারদের ধারণার সঙ্গে আমাদের প্রাথমিক ধারণা এবং অভিমত সম্পূর্ণ পৃথক—

জীবতত্ত্বের একটি সাধারণ কথা এইখানে জানিয়ে রাখা উচিত, নচেৎ প্রতিশব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। 'ডিয়ার' এবং 'অ্যান্টিলোপ', এই দুইটি প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রতিশব্দের প্রচলন বাংলা ভাষায় নেই, ফলে উভয় ক্ষেত্রেই 'হরিণ' কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'অ্যান্টিলোপ' এবং হরিণের মূল আকৃতিগত পার্থক্য তাদের শিং-এ। হরিণের শিং ডালপালা ছড়ানো গাছের মত, ইংরাজীতে বলে 'এ্যান্টলার'। অ্যান্টিলোপের শিং অপেক্ষাকৃত সোজা, ধারাল, ডালপালাহীন, ইংরাজী প্রতিশব্দ 'হর্ণ'। অধিকন্তু, হরিণের শিং খসে পড়ে এবং পুনরায় নির্গত হয়, অ্যান্টিলোপের শিং একবারই ওঠে, খসে না। কাহিনী পড়বার সময় এই কটি কথা মনে রাখতে হবে।

চীন-মুলুকের শয়তান

না, বই পড়ে শিকার হয় না। বই পড়া আর শিকার করা দুটো পুরোপুরি

আলাদা ব্যাপার। 'ইয়াংজে' নদীর তীরবর্তী উপত্যকায় একটা 'সেরাও' অ্যান্টিলোপ শিকার করতে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ শিকারী ক্রিশ্চিয়ান কোহ্‌ল যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার যে বিবরণ পেশ করেছিলেন, নীচে তার কিছু অংশ তুলে দিলাম—

"ইয়াংজে নদীর তীরেই আমি প্রথম সেরাও দেখলাম। তার আগে চিড়িয়াখানাতেও কোনদিন ঐ দুর্লভ প্রাণীটিকে চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। শিকারের নেশা আমাকে পেয়ে বসবার আগে ঐ বিষয়ে যাবতীয় বই নিয়ে আমি বিস্তর পড়াশুনা করেছিলাম এবং প্রাণীবিষয়ক আমার সেই পুস্তকলব্ধ জ্ঞানের তালিকায় 'সেরাও' নামক বিশেষ শ্রেণীর অ্যান্টিলোপটিও বাদ পড়েনি। ফলে এই ঘটনার আগে কোনদিন সেরাও না দেখলেও, প্রাণীটির আকৃতি, প্রকৃতি, মুখাবয়ব প্রভৃতি সম্পর্কে আমি বেশ ওয়াকিবহাল ছিলাম। শুধু দুটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না। প্রথমতঃ, ঐ প্রাণীটির ভয়ংকর স্বভাব চরিত্র এবং দ্বিতীয়তঃ, সাঁতারে তার অসাধারণ দক্ষতার কোন উল্লেখই বইয়ে ছিল না। আর এই দুটি অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকার ফল হয়েছিল প্রাণঘাতী, মর্মান্তিক।"

"ন্'গেই-লাই-ৎজে"।

আক্ষরিক অর্থে পাহাড়ী গাধা। এই হল সেরাও অ্যান্টিলোপের চীনে নাম। জন্তুটির প্রধান চারণক্ষেত্র পূর্ব হিমালয়ের সুউচ্চ শিখরদেশে। প্রায়শঃই দশ হাজার ফুট অথবা তদূর্ধ্ব উচ্চতায়। ভয়ংকর গিরিখাত ও তুষারঢালের বুকে এরা স্বচ্ছন্দ দ্রুততায় ঘুরে বেড়ায়, সমতল উপত্যকার বহু বিপদের সীমানা এড়িয়ে।

মহাযুদ্ধের কিছু আগে। চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ইয়ুনান প্রদেশের কুনমিঙ অঞ্চলে আমাদের কাহিনীকার মিঃ ক্রিশ্চিয়ান কোহ্‌ল ব্যবসার প্রয়োজনে ঘুরছিলেন। শিকার ছিল কোহ্‌লের সবচেয়ে প্রিয় নেশা। ফলে ব্যবসার কাজে ঘুরলেও চীন দেশের উক্ত অঞ্চলে, ব্যাপক অংশ জুড়ে তিনি বহু দুষ্প্রাপ্য জাতের ছাগল এবং হরিণ ঐ সময়ে শিকার করেছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন কোহ্‌ল একটি 'সেরাও' শিকারের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পূর্ব-হিমালয়ের দুরারোহ শিখরে শিখরে। কিন্তু আশ্চর্য, পর্বতচূড়ায় সেরাও-এর দেখা মিলল না, দেখা পেলেন অদ্ভুতভাবে 'ইয়াংজে'

নদীর তীরবর্তী সমতল উপত্যকার বুকে। বিচিত্র এই অনুসন্ধানের ইতিহাস—

স্থানীয় গাইড বা পথপ্রদর্শক 'চেন'-কে সঙ্গে নিয়ে শ্বেতাঙ্গ ক্রিশ্চিয়ান কোহ্‌ল দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে 'কুনমিঙ' এর সন্নিহিত পর্বত শিখরগুলির সুউচ্চ চূড়ায় ঘোরাঘুরি করেছিলেন। হাল্কা বাতাসে শ্বাসকষ্টের যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গকে অগ্রাহ্য করেও তাঁরা ঐ দুর্লভ প্রাণীটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। চেন-এর প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। কিন্তু ভাগ্য মন্দ। জন্তুগুলোর খুরের ছাপ মিললেও, চাক্ষুষ দর্শন মিলল না।

একটি দিনের কথা। শ্বেতাঙ্গ কোহ্‌ল এবং চেন উভয়ে দুটি পর্বতশিখরের মধ্যবর্তী কয়েকশ ফুট গভীর সঙ্কীর্ণ গিরিখাতের পাশে কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। হঠাৎ শিষের মত তীক্ষ্ণ এক নাসিকাধ্বনি কোহ্‌লের কানে এল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা পাথর আলগা হয়ে মাথার উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে অদৃশ্য হল গিরিখাতের অতলে। এক জীবন্ত ছায়ামূর্তি উপরের একটি গিরিশিখর থেকে অন্য পর্বতচূড়ায় লাফ দিয়ে চলে গেল।

"লাই-ৎজে"! চেন-এর কণ্ঠস্বর উত্তেজিত। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এরপর প্রায় চৌদ্দদিন ধরে বহু খোঁজাখুজির পরও সেরাও-এর দেখা পাওয়াতো দূরের কথা, কোন হদিশই পেলেন না তাঁরা। পরিশেষে হাল ছেড়ে দিলেন কোহ্‌ল। সেরাও খোঁজায় ইস্তফা দিয়ে সমতলভূমিতে নেমে আসাই সমীচীন মনে হল তাঁর।

কুনমিঙে ফেরার পথে হোয়াইলি নামক একটি স্থানে রাত কাটাতে হল কোহ্‌লকে। চেন-এর জনৈক আত্মীয় ছিল স্থানীয় অধিবাসী। হোয়াইলি অঞ্চলের অনতিদূরে বয়ে চলেছে পীত রঙের ইয়াংজে নদী। সেই ইয়াংজের তীরবর্তী অঞ্চলেই উক্ত আত্মীয়টির বাসস্থান। কোহলের অনুমতি নিয়ে সে রাত্রেই চেন তার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

পরদিন ভোরে সে যখন ফিরে এল, তখন সে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। তার দীর্ঘ বক্তব্যের সারমর্ম হিসাবে কোহ্‌ল বুঝলেন যে, ইয়াংজে নদীর পার্শ্ববর্তী উপত্যকায় প্রায়শঃই একটা সেরাও-এর আবির্ভাব ঘটে বলে চেন-এর আত্মীয়টি তাকে জানিয়েছে। প্রায়দিনই সে নাকি ক্ষেতে কাজ করতে করতে জন্তুটাকে দেখতে পায়। খাবার লোভে জন্তুটা রাত্রে নদী পার হয়ে এপাড়ে আসে এবং সারারাত ধরে ভোজনপর্ব সমাধা করে ভোর হওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে সাঁতরে নদী পার হয়ে অপর পাড়ে পাহাড়ের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যায়।

চেন-এর কথায় বেশ একটু চমকে গেলেন কোহ্‌ল। কারণ, দশ হাজার ফুটের নিরাপদ উচ্চতা ছেড়ে হঠাৎ কি কারণে একটা সেরাও সমতলভূমির বুকে অবতীর্ণ হতে পারে, সেটা তাঁর মাথায় ঢুকছিল না। কিন্তু কোহ্‌লের মনে সন্দেহ থাকলেও, চেন তার বিশ্বাসে অটল। শেষ পর্য্যন্ত সে তার আত্মীয়টিকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। সম্পর্কে সে হল চেন-এর এক নিকট সম্পর্কের ভাই।

'সাহেব' এবং তার ভাই-এর কথোপকথনের মধ্যে চেন দোভাষীর ভূমিকা নিল। কোহ্‌ল তাকে জন্তুটার বর্ণনা দিতে অনুরোধ করলে সে যা বলল, তার ফলে আর কোন সন্দেহ থাকার কারণ ছিল না। চেন-এর ভাইয়ের বর্ণনা অনুসারে প্রাণীটা বেঁটে কিন্তু বলিষ্ঠ গড়নের, ছাগলের আকৃতি বিশিষ্ট। ওজনে হবে প্রায় দু'শ পাউণ্ড। গায়ের চামড়া লাল রঙের—রোমশ। ছোট ছোট দুটি শিং সোজা এবং ধারালো। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য জন্তুটার কান দুটো। খাড়া ছুঁচোলো—একদম গাধার মত। কোহ্‌লের পক্ষে এই বর্ণনা যথেষ্টরও বেশী। না:, চেন-এর ধারণা অভ্রান্ত ; ঐ গাধার কানওয়ালা মাথাটিই স্মারকচিহ্ন হিসাবে কোহ্‌লের প্রয়োজন। এই প্রাণীটার খোঁজেই এতদিন ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন তাঁরা।

চেন-এর ভাই কোহ্‌লকে আরও জানাল যে, নদীর অপর পাড়ে জন্তুটার যাতায়াতের পথে একটা গর্তের ফাঁদ কেটে সে ওটাকে ধরার চেষ্টা করেছিল। গর্তের মুখ নমনীয় গাছের ডাল এবং পাতা প্রভৃতি দিয়ে এমনভাবে ঢাকা ছিল যার ফলে কোনমতেই ফাঁদের হদিশ পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু আশ্চর্য্য অনুভূতি বলে হরিণটা আজও নাকি গর্তটাকে এড়িয়ে চলাফেরা করে চলেছে।

কথাবার্তা শেষ হলে কোহ্‌ল 'আত্মীয়টির' কাছে একটা প্রস্তাব রাখলেন। হরিণটাকে মারলে কেবলমাত্র মাথাটিই তিনি নেবেন, বাকী দেহাংশ হবে ঐ আত্মীয়টির প্রাপ্য। উত্তম প্রস্তাব। গররাজী হওয়ার মত কিছু দেখতে পেল না চেন-এর ভাই। সে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল।

পরদিন সকালে অকুস্থলে পৌঁছে ক্রিশ্চিয়ান কোহ্‌ল এবং চেন উভয়েই 'সাম্পানে' চড়ে নদী পার হলেন। সাম্পান চীনদেশের একধরনের নৌকা। অপর পাড়ে অবতীর্ণ হয়ে সামান্য অনুসন্ধানেই নজরে পড়ল সেরাওটার যাতায়াতের পথ। মসৃণতা দেখে বোঝা যায় যে পথটি বহুব্যবহৃত। প্রায় শ-খানেক গজ

এগিয়ে গিয়ে ফাঁদটাও আবিষ্কার করলেন তাঁরা দুজন। ছড়ানো-ছিটানো গাছের ফাঁকে ফাঁকে চলে যাওয়া পথের উপর লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা একটি গর্ত!

দুজনেই ঠিক করলেন যে, পরদিন প্রত্যুষে নদীর যে পাড়ে হরিণটা খাদ্য সংগ্রহের জন্য আসে অর্থাৎ চেন-এর আত্মীয় যে পাড়ে বাস করে; সেই খানেই তাঁরা জন্তুটার জন্য অপেক্ষা করবেন। সমতলভূমির উপর হরিণ শিকার অবশ্যই কোন রোমাঞ্চকর ঘটনা নয়; কিন্তু সেরাও-এর সন্ধানে কোহ্‌ল যে পরিমাণ নাজেহাল হয়েছিলেন, তাতেই সে আপশোষটুকু পুষিয়ে গিয়েছিল।

পরদিন ভোর···

ইয়াংজের পীতরঙের জলে সূর্যোদয়ের লাল আলো তখনও বিচিত্র বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করে নি। নদীর পাড়ে একটা পাতাঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিলেন কোহ্‌ল এবং তাঁর সঙ্গী। ধীরে ধীরে সময় কাটতে লাগল। ক্রমে কেটে গেল সুদীর্ঘ কয়েকটি ঘণ্টা। শিকারীদের সতর্কতা এবং মানসিক চাপেও ঢিলে পড়তে লাগল। কোহ্‌লের তো বেশ একটু গা-ছাড়া দেবার ভাব এসে গিয়েছিল। এমন সময় অল্প দূরে গাছ পালার সঙ্গে কোন সচল বস্তুর ঘর্ষণের খস্‌খস্ শব্দ কানে ভেসে এল, তারপরই শিকারীদের উন্মুক্ত দৃষ্টিপথে নদীর তীরবর্তী জমির উপর আবির্ভূত হল একটা বেশ বড়সড় সেরাও। অদ্ভুত আকৃতির মাথাটা উপর নীচে করতে করতে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছিল নদীর দিকে।

বিগত ঘণ্টাকয়েকের নিষ্ক্রিয়তা কোহ্‌লের মধ্যে সাময়িক আলস্য এনে দিয়েছিল, ফলে বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করতে যে সময়টুকু গেল তার মধ্যে হরিণটা সচকিত হয়ে এক বিরাট লাফে প্রায় পনেরো ফুটের মত জমি পেরিয়ে নদীর জলে গিয়ে পড়ল। স্বাভাবিক কারণেই শিকারীর গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। নদীবক্ষে অর্ধনিমজ্জিত জন্তুটার মাথার অল্প দূর দিয়ে কোহ্‌লের বুলেট জল ছিটকে বেরিয়ে গেল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের ভাগ্যকেও ধন্যবাদ দিলেন কোহ্‌ল। আরেকটু হলেই সর্বনাশ হয়েছিল আর কি! যে স্মৃতিচিহ্নর জন্য এত পরিশ্রম, সেই মাথাটাই তিনি অল্পের জন্য গুঁড়িয়ে দিতে বসেছিলেন। সে যাই হোক, তখনকার মত আর গুলি করার সুযোগ পেলেন না কোহ্‌ল। একমাত্র উপায় নৌকায় চড়ে জন্তুটার পশ্চাদ্ধাবন করা।

"সাম্পান"!

আড়াল ছেড়ে লাফিয়ে উঠে কোহ্‌ল ছুটলেন নদীর দিকে। মুহূর্তমাত্র দেরী না করে নৌকা খুলে দুজনেই তাড়া করলেন জন্তুটার পিছনে।

কিন্তু চেন নৌকার গতি বৃদ্ধি করতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করলেও খানিকক্ষণের মধ্যেই কোহ্‌ল বুঝতে পারলেন যে, এইভাবে সেরাওটার নাগাল পাওয়া অসম্ভব, কারণ অসাধারণ দৈহিক পটুতায় সে ক্রমেই নৌকার সঙ্গে তার নিজের ব্যবধান বাড়িয়ে চলেছে। সেরাও যখন অপর পাড়ে প্রায় পৌঁছে গেছে, কোহ্‌লের সাম্পান তখন তার দু'শ ফুট পিছনে! বাধ্য হয়েই কোহ্‌ল তাঁর মত পাল্টালেন। তিনি ঠিক করলেন যে, হরিণটা নদীর পাড়ে উঠলেই গুলি করবেন।

কোহ্‌ল বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হলেন, কিন্তু হরিণ জমির উপর উঠল না। হঠাৎ ঘুরে সাঁতার কেটে এগিয়ে এল নৌকার দিকে। জন্তুটার অকস্মাৎ মতি পরিবর্তনের কারণ কোহ্‌ল তখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেন নি, যদিও চেন তৎক্ষণাৎ সাম্পানটার গতিপথ পরিবর্তন করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। চেন এর প্রচেষ্টা আংশিক সফল হলেও লাভ বলতে তেমন কিছু হল না, নিজস্ব ভরবেগের ধাক্কায় নৌকা এগিয়ে গেল নিকটবর্তী নদীর পাড়ের দিকে। দ্রুতগতিতে জল কেটে নৌকার নিকটবর্তী হল ছাগলের মত আকৃতি বিশিষ্ট জন্তুটা, শুধুমাত্র তার অদ্ভুত মাথা এবং দেহের উপরিভাগের কিছু অংশ জলের উপরে দৃশ্যমান। কোহ্‌লের যথেষ্ট সুযোগ ছিল গুলি করার, কিন্তু মৃতদেহটা গভীর নদীগর্ভে তলিয়ে যাবে এই আশঙ্কায় তিনি বিরত হলেন। সেরাওটা ততক্ষণে নৌকার একদম পাশে এসে পড়েছে। জন্তুটার গতিবিধি কোহ্‌লের ভাল ঠেকছিল না, বন্দুকের কুঁদোর সাহায্যে জন্তুটাকে নৌকার পাশ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সচেষ্ট হলেন।

এমন সময় ঘটল সেই অঘটন। কোহলের হস্তধৃত বন্দুকের বাঁট সেরাওয়ের দেহ স্পর্শ করার আগেই হতচ্ছাড়া জানোয়ারটা অকস্মাৎ সামনের পা-দুটো জলের উপরে তুলে চকিতের মধ্যে একজোড়া ভারী হাতুড়ির মত প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানল সাম্পানটার এক পাশে! পরমুহূর্তে, উল্টে যাওয়া নৌকার পাশে জলের উপর ছিটকে পড়লেন কোহ্‌ল এবং তাঁর চৈনিক সঙ্গী চেন।

সঙ্গীন মুহূর্ত! ঘটনার আকস্মিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠে কোহ্‌ল প্রাণপণে সাঁতার কাটতে লাগলেন পাড়ের দিকে, নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে অন্য কোন দিকে তাকাবার সময় বা ইচ্ছা কোনটাই তাঁর ছিল না। এমন সময় চেন-এর অসহায় আর্তনাদ তাঁর কানে প্রবেশ করল। আর সঙ্গে সঙ্গে কোহ্‌লের

মনে পড়ে গেল—চেন সাঁতারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ! একটু দূরে তখন সে প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেছে কোনক্রমে জলের উপরে ভেসে থাকতে। কোহ্‌ল ফিরলেন।

চেন-কে সঙ্গে নিয়ে সাঁতার কাটা দুজনের পক্ষেই বিপজ্জনক। সামনে ভাসছিল উল্টে যাওয়া সাম্পান, চেনকে সেটা আশ্রয় করে ভেসে থাকতে বলে কোহ্‌ল পুনরায় সাঁতার কেটে এগিয়ে চললেন পাড়ের দিকে। হঠাৎ পিছন থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ শিষের মত নাসিকাধ্বনি। সেই সঙ্গীন মুহূর্তেও কোহ্‌লের মনে পড়ে গেল পূর্ব-হিমালয়ের একটি গিরি খাতের পাশে দাঁড়িয়ে

অবিকল এই রকম শিষের শব্দই শুনেছিলেন তিনি। পিছনে তাকিয়ে দেখলেন স্ফুরিতনাসা উন্মত্ত অ্যান্টিলোপ জল কেটে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। একটা তিক্ত শপথবাক্য নির্গত হল কোহ্‌লের মুখ দিয়ে, সর্বশক্তি নিয়োগ করে তিনি সাঁতরে চললেন পাড়ের দিকে। কোহ্‌ল অবশ্য বুঝেছিলেন যে, উল্টে যাওয়া নৌকায় সংলগ্ন চেন-এর চেয়ে তাঁর দিকেই হরিণটার দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক, কিন্তু যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে সাঁতরে যাওয়া ছাড়া আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় তখনকারমত তাঁর মনে পড়ল না। কোহ্‌ল জন্তুটার অসাধারণ দৈহিক পটুতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন, ফলে প্রতিমুহূর্তেই তিনি তাঁর পিঠ অথবা কাঁধের উপর দুটো খুরের প্রচণ্ড আঘাত আশঙ্কা করছিলেন। কিন্তু নদীর পাড়ের বালি যখন কোহ্‌লের পায়ে ঠেকল, কোন্ অজানিত কারণে তখনও তাঁর দেহ সম্পূর্ণ অক্ষত। আতঙ্কিত কোহ্‌ল এবার চেষ্টা করলেন প্রাণপণে দৌড়ে জীবনরক্ষা করতে, কিন্তু বালিতে পা ঢুকে বারবার তার গতি রুদ্ধ হতে লাগল।

আচম্বিতে নদীবক্ষ থেকে ভেসে এল এক তীক্ষ্ণ আর্তনাদ! ঘুরে নদীর দিকে চোখ ফেরাতেই কোহ্‌লের নজরে পড়ল এক মর্মন্তুদ দৃশ্য—

কোহ্‌লকে তাড়া করার পরিবর্তে জন্তুটা উল্টে যাওয়া সাম্পানটার দিকে এগিয়ে এসে আঘাত করল সেটার পৃষ্ঠদেশে। ফোয়ারার মত জল ছিটকে উঠল উপরে এবং নৌকা ও তার সাথে সংলগ্ন চেন কয়েক মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হল নদীগর্ভে। একটু পরে উভয় বস্তুই নদীর বুকে পুনরায় ভেসে উঠল বটে, কিন্তু বেশ কয়েক গজ দূরত্বে। প্রাণরক্ষার প্রচেষ্টায় চেন-এর পাগলের মত হাত-পায়ের সঞ্চালন সহজেই উন্মত্ত হরিণটার দৃষ্টিগোচর হল। কৌতূহলী হয়ে সে এগিয়ে এল তার দিকে। হরিণটাকে দেখামাত্রই হতভাগ্য চেন-এর গলা দিয়ে প্রচণ্ড আতঙ্কে বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, কিন্তু শুধু চীৎকার করে আত্মরক্ষা করা যায় না। অ্যান্টিলোপের সামনের দুটো পা জলের উপর একবার দৃশ্যমান হল, তারপরই নির্ভুল লক্ষ্যে নেমে এসে আঘাত হানল শিকারের দেহে। চেন-এর আর্তনাদ পরিণত হল একটা অস্ফুট ঘড় ঘড় শব্দে তারপর তার দেহ অদৃশ্য হল নদীগর্ভে। সঙ্গীর জীবন রক্ষার শেষ প্রচেষ্টায় কোহ্‌ল নদীর পাড থেকে কতকগুলো পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে ক্রমাগত ছুঁড়তে লাগলেন সেরাওটাকে লক্ষ্য করে। উদ্দেশ্য, যদি চেনকে ছেড়ে কোহ্‌-লের দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত পাগলের মত নদীতে ঝাঁপ দিয়ে কোহ্‌ল সাঁতরে সঙ্গীর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তখন

অনেক দেরী হয়ে গেছে। ইয়াংজের হলুদ জলে দাঁড়িয়ে সঙ্গীর মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করা ছাড়া অসহায় কোহ্‌লের করার মত আর কিছুই নেই।

বারকয়েক নদীর জলে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সেরাও, কিন্তু চেন-এর কোন সন্ধান মিলল না কোথাও। নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ ফেরাতে এবার তার নজর পড়ল স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকা কোহ্‌লের উপর। নাক দিয়ে শিষের মত শব্দ করে সে তার ক্রোধের অভিব্যক্তি প্রকাশ করল, তারপর তীরের মত জল কেটে এগোল তাঁর দিকে।

বিপদ আসন্ন!

কোহ্‌ল বুঝলেন যে এবার তাঁর পালা। নিরস্ত্র, অসহায় কোহ্‌ল আত্মরক্ষার্থে সচেষ্ট হলেন। সাম্পান উল্টে যাওয়ার সময় রাইফেল তলিয়ে গেছে নদীবক্ষে, সুতরাং নাগালের মধ্যে যে গাছগুলো রয়েছে তারই একটাতে আশ্রয় নেওয়া নিরাপদ বলে তাঁর মনে হল। অনতিদূরের অরণ্য ঘন সন্নিবিষ্ট নয়, এধারে ওধারে ছড়ানো বড বড় গাছের সমাবেশে গঠিত। তারমধ্যে, ওক্, চেষ্টনাট এবং পাইন গাছই বেশী। প্রথম দুটি জাতের গাছ অত্যন্ত শক্ত হলেও, তাড়াতাড়ি ওঠার পক্ষে সুবিধাজনক নয়। ফলে কাছে একটা পাইন গাছের নীচে ঝুঁকে পড়া ডাল ধরে তাডাতাড়ি উঠে পডলেন কোহ্‌ল। কিন্তু নিরাপদ উচ্চতায় আরোহণ করলেও, গাছে উঠে কোহ্‌ল আবিষ্কার করলেন যে, আশ্রয়ের পক্ষে গাছটি ঠিক উপযুক্ত নয়। ডালগুলো বেশ নরম এবং পলকা, কিন্তু নতুন করে অন্য কোন গাছের কথা চিন্তা করার মত সময় তখন আর নেই। ওরই মধ্যে অপেক্ষাকৃত শক্ত একটা গাছের ডালকে আশ্রয় করে কোহ্‌ল বসে রইলেন

নদীর জলে আলোডন তুলে তীরে উঠে এল ক্রুদ্ধ সেরাও। গাছের ডালে বসে কোহ্‌ল নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ করে রইলেন। কিন্তু জন্তুটার চোখ এবং কানকে ফাঁকি দিলেও ঘ্রাণশক্তিকে ফাঁকি দিতে পারলেন না তিনি।

বাতাসে ঘ্রাণ নিতে নিতে জন্তুটা পাইন গাছের খানিকটা দূরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সন্দেহের দৃষ্টি দিয়ে গাছটাকে খানিকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে পিছিয়ে এল সে। তারপর সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে দুরন্ত বেগে ছুটে গেল গাছটাকে লক্ষ্য করে। একটা প্রচণ্ড ঢু‘-এ থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো গোটা গাছটা, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা যন্ত্রণার অভিব্যক্তিও ফুটে উঠল হরিণের দেহে। আবার পিছিয়ে গেল উন্মত্ত আন্টিলোপ, এবং কোহ্‌ল সভয়ে আবিষ্কার করলেন যে, তিনি যে ডালটিকে আশ্রয় করে বসে আছেন, সেটি এর মধ্যেই

চিড খেতে শুরু করেছে। আর একমুহূর্তও এই গাছটাকে আশ্রয় করে বসে থাকা সম্ভব নয়।

অদূরবর্তী একটা ওক গাছকে আশ্রয়ের জন্য মনে মনে নির্বাচিত করলেন কোহ্‌ল। কিন্তু নীচে অপেক্ষমান শৃঙ্গী, মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে গাছটায় আশ্রয় নেওয়া খুব সোজা কাজ নয়। সুযোগ খুঁজতে লাগলেন কোহ্‌ল।

প্রথম সংঘাতের যন্ত্রণায় জন্তুটা গাছের থেকে খানিকটা দূরে পিছিয়ে গিয়েও, তেড়ে আসার বদলে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে ছিল। এই সুযোগ কোহ্‌ল হাতছাড়া করলেন না। গাছের উপর থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন ওক গাছটার দিকে। মাটির উপর ভারী বস্তুর পতনের শব্দে যেন সম্বিত ফিরে এল জন্তুটার। বিদ্যুৎ গতিতে সে ছুটে গেল পলায়নে তৎপর শিকারের দিকে। নাঃ, ওক গাছ পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পারলেন না কোহ্‌ল। মাঝপথে দুটো শিং-এর মারাত্মক সংস্পর্শ অনুভূত হল তাঁর কটিদেশের নিম্নভাগে, তারপরেই শূন্যপথে উৎক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর দেহ আছড়ে পড়ল বেশ কয়েক গজ দূরে জমির উপর। পতনের আঘাতে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে এল কোহ্‌লের চোখের সামনে। 'শিরদাঁড়ায় তীব্র যন্ত্রণা—পিঠটা ভেঙে গেছে বলে মনে হল তাঁর।

আবার সেই তীক্ষ্ণ শিষ। দারুণ আতঙ্ক এবং ভয় কোহ্‌লকে তাঁর দুটো হাঁটুর উপর দাঁড় করিয়ে দিল, কিন্তু দৌড়োনো দূরের কথা, এক পা এগোবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন তিনি ; ফলে ঐ অর্দ্ধেক বসা অবস্থায় তিনি প্রতিমুহূর্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন চরম আঘাতের জন্য। কিন্তু আঘাত এল না, পরিবর্তে ভেসে এল সংঘাতের ভারী শব্দ। কোহ্‌ল আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে হরিণটা ঐ পাইন গাছের কাণ্ডে ক্রমাগত গুঁতো মেরে চলেছে। সম্ভবতঃ সংঘর্ষের যন্ত্রণায় পাগল হয়ে সে গাছটাকেই তার প্রধান শত্রু বলে মনে করেছে। অবশ্য, সেই সঙ্গে কোহলের বুঝতে ভুল হলনা যে, তাঁর এ নিষ্কৃতি সাময়িক। গাছের উপর রাগ মিটিয়ে জন্তুটা একটু পরেই তাঁর দিকে ছুটে আসবে। এই কথাটা উপলব্ধি করে, অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও কোহ্‌ল ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে হরিণটার দৃষ্টির আড়ালে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হলেন।

কিছুটা পথ ঐ ভাবে অতিক্রম করার পর হাতে ঠেকল নরম এবং নমনীয় ডালপালা ছড়ানো জমি, আর ভালভাবে একটু পর্যবেক্ষণ করেই জায়গাটার স্বরূপ চিনতে ভুল হল না কোহ্‌লের। ডালপালা দিয়ে আচ্ছাদিত একটা গর্ত—চেন-এর ভাইয়ের পাতা ফাঁদ! ধীরে ধীরে শরীরটাকে ফাঁদের অন্তধারে টেনে নিয়ে

গেলেন কোহ্‌ল, তাঁর মাথায় তখন এক চমকপ্রদ চিন্তার তরঙ্গ। সেরাও এবং কোহলের মাঝখানে ঐ ফাঁদ। একটা মারাত্মক ঝুঁকি নেওয়ার জন্ম প্রস্তুত হলেন কোহ্‌ল।

সমস্ত প্রাণশক্তি জড়ো করে সোজা হয়ে বসে তার-স্বরে চীৎকার করতে করতে হাত দুটো নাড়াতে লাগলেন কোহ্‌ল। উদ্দেশ্য হরিণটার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। গাছে ঢুঁ মারা বন্ধ করে ফিরে তাকাল রক্তচক্ষু হরিণ। তারপরই জ্যা মুক্ত তীরের মত ছুটে এল কোহ্‌লের দিকে। তীব্র উত্তেজনার মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন কোহ্‌ল। সেরাও যদি ফাঁদের হদিশ পেয়ে যায় তাহলে শিং এবং খুরের নিষ্ঠুর আঘাতে কোহ্‌লের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন। ঝড়ের বেগে ছুটে আসা হরিণের সামনের দুটো পা এসে পড়ল নরম ডালপালাগুলোর উপর এবং পরমুহূর্তেই তার গোটা দেহ অদৃশ্য হল কোহলের চোখের সামনে থেকে। গর্তের মধ্য থেকে শুধু ভেসে আসত লাগল ক্রুদ্ধ অ্যান্টিলোপের তীক্ষ্ণ নাসিকা ধ্বনি এবং গর্তের চারিধারে মাটির দেওয়ালে অধৈর্য্য খুরের আঘাতের শব্দ।

অর্ধ-অচেতন অবস্থায় গর্তের ধারে পড়ে থাকতে থাকতে প্রায় আধঘণ্টা বাদে কোহ্‌লের কানে ভেসে এল স্থানীয় চীনাভাষায় কয়েকজন লোকের কথাবার্তার শব্দ। সাহায্যের জন্ম চীৎকার শুনে তারা অবশেষে এসে কোহ্‌লকে আবিষ্কার করে। উদ্ধারকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিল চেন-এর ভাই। সাম্পান নিয়ে চেন্ এবং কোহ্‌ল যাত্রা করার বহুক্ষণ পরেও তাদের কোনরকম খোঁজ খবর না পেয়ে সে প্রতিবেশীর নৌকায় চড়ে সন্ধান করতে বেরিয়ে পড়ে।

হোয়েইলীতে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে কোহ্‌ল সাংহাইতে এসে পৌছালেন এবং সেই সময়ে ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা যায় যে মেরুদণ্ড নয়, ভেঙেছে তাঁর নিতম্ব দেশের হাড়। শল্যচিকিৎসার সাহায্যে তিনি আরোগ্যলাভ করেন।

পরিশিষ্ট না বললে বর্তমান কাহিনী অসমাপ্ত থেকে যায়—শিকারী ক্রিশ্চিয়ান কোহ্‌লের বিবরণী থেকে আমি এই অংশটি তুলে দিচ্ছি—

"হোয়েইলীতে থাকতে থাকতেই আমি চেন-এর মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদ তার আত্মীয়দের দিয়েছিলাম এবং ঘটনারও বিবরণ দিয়েছিলাম। তার কয়েকদিন পরে সেরাওটার মাথা স্মারক হিসাবে সংগ্রহ করতে গিয়ে শুনলাম যে ঐ হরিণটাকে নাকি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস উক্ত "নুগেই-লাই-ৎজে", চেনকে হত্যা করে নিঃসন্দেহে কোন দৈবশক্তির অধিকারী হয়েছে।

মহাযুদ্ধের যবনিকা তখন ধীরে ধীরে চীনের উপর নেমে আসছে, কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোনদিন যদি আমার নিম্নাঙ্গের সচলতা ফিরে আসে, তবে সেদিনই আমি ইয়াংজে নদীর পাড়ে একটা সেরাও অ্যান্টিলোপের সঙ্গে আমার কিছু বাকী হিসাব চুকাতে যাব। তা সে দৈবশক্তির অধিকারী হোক্ বা নাই হোক্।"

সুদানের খুনী

আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় জমে গেলেন রয় হেলভিন। যদিও তাঁর সতর্কবাণী আয়োমকে মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে আনতে পারত না, কিন্তু সেটুকু আওয়াজও তার গলা দিয়ে বেরুল না। সুদানের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে নিরস্ত্র, অসহায় হেলভিনকে প্রত্যক্ষ করতে হল, উপকথার জগৎ থেকে নেমে আসা এক বিচিত্র প্রাণীর ভয়াবহ আক্রমণে সঙ্গী আয়োমের মর্মান্তিক মৃত্যু।

স্থানীয় সুদানীদের দৈহিক পটুতা অসাধারণ। আয়োমের ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম ছিল না। এক ঝলক কালো বিদ্যুতের মত সে দৌড়ে চলেছিল একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক থেকে একটা রাইফেল সংগ্রহ করে আনতে। অপেক্ষমান লরিটির কাছে তার আর পৌঁছনো হল না। কি ঘটতে চলেছে তা বোঝবার আগেই পিছন থেকে প্রচণ্ড আঘাতে দুটো শিং তার দেহটাকে গেঁথে ফেলল। পরক্ষণেই দুটো শিকে গাঁথা ঝলসানো মাংসপিণ্ডের মত শূন্যে ঝুলতে লাগল আয়োমের দেহ। আতঙ্কিত হেলভিন দেখলেন, পাঁজরের ঠিক নীচে দিয়ে দু-দুটো শিং-ই দেহটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে গেঁথে ফেলেছে। আয়োমের তীব্র যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল। তারপর একসময় স্তব্ধ হয়ে গেল · সব শেষ! হেলভিন বুঝলেন, ফুসফুসে রক্ত প্রবেশ করেছে।

তবে কেবল হেলভিন নয়, আয়োমের হত্যাকারীও বুঝতে পেরেছিল সে কথা। তার ঘাড় ও গলার শক্তিশালী পেশীর একটিমাত্র সঞ্চালনে শিং-এ বিদ্ধ আয়োমের প্রাণহীন দেহ প্রায় ফুট বারো দূরের মাটির উপর গিয়ে আছড়ে পড়ল। হত্যার উন্মাদনা তখনও জন্তুটার সম্পূর্ণ মেটে নি। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে হেলভিন দেখলেন, দুটি বিশাল বর্শাফলকের মত শিং-এর ক্রমাগত আঘাতে কেমন করে কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে আয়োমের মৃতদেহ পরিণত হল একটি রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে।

পাঠক-পাঠিকাকে আপাততঃ এইখানে রেখে আমরা চলে যাব কাহিনীর প্রারম্ভে—

মাত্র মিনিট কয়েক আগের ঘটনা। শিকারী রয় হেলভিন এবং তাঁর স্থানীয়

সুদানী অনুচর আয়োম তাঁবু থেকে মাত্র শ-খানেক গজ দূরে প্রবহমান ক্ষীণ জল-ধারাটির পাড়ে, ঘোর বাদামী রঙের একটা সুদৃশ্য অ্যান্টিলোপের মৃতদেহ থেকে চামড়া সংগ্রহ করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এই ধরণের কাজগুলো হেলভিন নিজে বিশেষ দেখতেন না, তারজন্য আলাদা লোক নিযুক্ত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি একটা লেপার্ডের চামড়া ছাড়াতে গিয়ে তারা অত্যন্ত কাঁচা হাতের কাজ দেখায়। ছাড়ানো চামড়াটার মধ্যে লেপার্ডের চোখ এবং ঠোঁটের অংশে খুঁত থেকে যায়। অপূর্ব চামড়াটার ক্ষতি হওয়ার ফলে, হেলভিন ঠিক করেন যে এর পর থেকে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে ঐ কাজের তত্ত্বাবধান করবেন, এমনকি দুয়েক দিনের মধ্যেই খুঁজেপেতে তিনি নতুন একটি দক্ষ ব্যক্তিকে ঐ কাজের জন্য সংগ্রহ করেন। সেই হল আয়োম। পূর্বপরিকল্পনামত, হেলভিন এবং আয়োম যে মৃতদেহটি থেকে চামড়া সংগ্রহ করছিলেন, সেটি প্রায় চার ফুট উঁচু, একটা ঘোর বাদামী রঙের অ্যান্টিলোপ। জন্তুটার প্রত্যেকটা শিং-এর দৈর্ঘ্য প্রায় দু ফুট করে। শিকারীর সংগৃহীত স্মারক হিসাবে অপূর্ব, সন্দেহ নেই।

ছ-জন ভৃত্যের সাহায্যে প্রায় পাঁচশ পাউণ্ড ওজনের মৃতদেহটা যখন স্রোতস্বিনীর পাড়ে এনে রাখা হল তখনই সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে এসেছে। নদীর পাড়ে কাজটা সারবারও একটা কারণ ছিল। প্রথমতঃ পরিত্যক্ত শবদেহটা যাতে জলের স্রোতে বহুদূরে চলে যায়, এবং দ্বিতীয়তঃ মাংসের লোভে তাঁবুর আশেপাশে রাত্রে যেন কোন "অবাঞ্ছিত অতিথির" আবির্ভাব না ঘটে। একটু পরেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসবে। হেলভিন এবং আয়োম উভয়েই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দ্রুত কাজ সারছিলেন।

হঠাৎ হেলভিন আবিষ্কার করলেন যে তাঁদের পায়ের তলার মাটি কাঁপছে এবং দূর থেকে সমুদ্র গর্জনের মত ভেসে আসছে অস্ফুট শব্দের তরঙ্গ। প্রথমে দুজনের কেউই বিশেষ গা দিলেন না ব্যাপারটায়, কিন্তু তরঙ্গধ্বনি ক্রমশঃ স্পষ্ট এবং নিকটবর্তী হতে, কৌতূহল নিরসনের জন্য হেলভিনই প্রথম উঠে দাঁড়ালেন।

সম্মুখবর্তী লম্বা ঘাসের জঙ্গল। তার উপর দিয়ে চোখ চালিয়ে নজরে পড়ল দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা একদল শৃঙ্গী প্রাণী। আফ্রিকার অরণ্যে শিং-এর বাহকের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু কালোমাটি আর ঘাসজঙ্গলের পটভূমিতে প্রায় মিশে যাওয়া জন্তুগুলো নিকটবর্তী হলে, হেলভিন দেখলেন তাদের প্রত্যেকের মুখমণ্ডল বেষ্টন করে চলে গেছে একটা কালো দাগ। দুটি শিং যেন দুটি বিরাট সমান্তরাল সরলরেখা—অরিক্স! চিনতে ভুল হল না হেলভিনের, সংখ্যায় প্রায়

গোটা চব্বিশ। আফ্রিকার জঙ্গলে এই দুর্লভ শ্রেণীর অ্যান্টিলোপের দলকে এত কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য খুব কম শিকারীর জীবনেই আসে। অরণ্যআদিম আফ্রিকার বিস্তীর্ণ তৃণভূমির বুকে সারি সারি শিং-এর সঙিন উঁচিয়ে ছুটে চলেছে শরীরী সৌন্দর্য্যের এক বিচিত্র তরঙ্গ। অপূর্ব! অদ্ভুত! মুগ্ধ বিস্ময়ে রয় হেলভিন নিরীক্ষণ করছিলেন সেই সৌন্দর্য্যপ্রবাহ, আয়োমও ততক্ষণে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে উঠেছে। সঙ্গীর চাপা সতর্ক কণ্ঠস্বরেই চমক ভাঙলো হেলভিনের।

—"সিংহ"!

চোখ ফেরাতেই নজরে পড়ল, ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অরিক্সের দলটির বেশ খানিকটা পিছনে ক্রমশঃ নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে একটি উড়ন্ত ধূলোর মেঘ। আর সেই ধূলোর আস্তরণের মধ্যে হালকা বাদামী রঙের একটি পরিচিত অবয়ব আবিষ্কার করলেন হেলভিন—হ্যাঁ সিংহই বটে!

"রাইফেল! শীগগির!" মাত্র দুটি শব্দ নির্গত হল আয়োমের গলা দিয়ে।

ততক্ষণে সে দৌড় শুরু করেছে অদূরে অপেক্ষমান "সাফারী ট্রাক"-এর দিকে। উদ্দেশ্য একটা রাইফেল সংগ্রহ করে আনা। কিন্তু হেলভিন তাকে ডেকে ফিরিয়ে আনলেন। কারণ, প্রথমতঃ সিংহের মনোযোগ পলায়নে তৎপর অরিক্সের দলটির উপরই নিবদ্ধ এবং দ্বিতীয়তঃ নিজেরা কোনরকম দৌড়ঝাঁপ করে সিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সদিচ্ছা হেলভিনের ছিল না। অরণ্য নাটকের এই বিরল মুহূর্তগুলি নিরীক্ষণ করার সৌভাগ্য থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করতে চান না।

ততক্ষণে মাত্র দেড়শ গজ দূরে এসে পড়েছে দলটি। রাইফেল সংগ্রহে ইস্তফা দিয়ে আয়োম এসে দাঁড়ালো হেলভিনের পাশে।

সম্মুখে দুটি মনুষ্যমূর্ত্তির অবস্থিতি! নতুন বিপদের আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ গোটা দলটা গতির সমতা বজায় রেখে বাঁ দিকে মোড় নিল। কেবল দলের শেষভাগে একটা অ্যান্টিলোপের কাছে চমকটা একটু বেশী হয়ে থাকবে। আকস্মিক বিস্ময়ে সে সামনের দুটো পা ঘাসজমির উপর আটকে কোনক্রমে তার দুরন্ত গতি রুদ্ধ করল। দেহভার ন্যস্ত হল পিছনের দুটি পায়ের উপর। একটা অপূর্ব পুরুষ হরিণ। কিন্তু জঙ্গলের প্রাণীদের বেশীক্ষণ বিস্মিত হওয়ার অবকাশ মেলে না। নাগালের মধ্যে শিকার—কালো ঘাসজমির উপর চমকে উঠল ধূসর বিদ্যুৎ। পশুরাজ আক্রমণ করল ...

প্রসঙ্গ তঃ, এখানে জানিয়ে রাখা ভাল যে, সিংহ শিকার ধরবার জন্য একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করে। শিকারের পিছনে তাড়া করতে করতে সে হঠাৎ শিকারের পিঠে লাফিয়ে ওঠে এবং তার ঘাড় প্রচণ্ড দংশনে চেপে ধরে মাটির উপর পেড়ে ফেলে। তারপরই স-নখ থাবার একটিমাত্র চপেটাঘাতে হতভাগ্য প্রাণীটির কণ্ঠনালী ছিন্ন হয়ে যায়।

কিন্তু এইক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটল।

প্রাণভয়ে মরীয়া হয়ে, আক্রমণে উদ্যত সিংহের দিকে রুখে দাঁড়াল বিপুলবপু অরিক্স। সিংহ এই অভাবনীয় পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না, ফলে চার-ফুট করে লম্বা দু-দুটো ক্ষুরধার সঙ্গিনের মারাত্মক সান্নিধ্য এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে বহু চেষ্টা করেও সম্ভব হল না। পশুরাজের গতিরুদ্ধ হওয়ার আগেই একটা শিং তার কণ্ঠদেশ বিদ্ধ করে ঘাড় ও গলার সন্ধিস্থল দিয়ে নির্গত হল, এবং অপরটি প্রায় আমূল প্রবিষ্ট হল তার বুকে। ঘাড় ও মাথার দ্রুত সঞ্চালনে অরিক্স তার শিং দুটো মুক্ত করে নিল, তারপর পুনরায় আঘাত হানল শত্রুর দেহে। চরম আঘাত—সিংহের নরম উদরে বিদ্ধ হল দুটি বিশাল শৃঙ্গ। পশুরাজের প্রাণহীন দেহ গড়িয়ে পড়ল বিস্তীর্ণ তৃণভূমির বুকে।

ঘটনা প্রবাহের নাটকীয়তা রয় হেলভিন ও তার সঙ্গী আয়োমকে সম্মোহিত করে দিয়েছিল। নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে ছিলেন দুজনে।

অরিক্স শিকারের আশা হেলভিনের বহুদিন লালিত। কিন্তু শিকার করা তো দূরের কথা, অধিকাংশ সময়েই সদাসতর্ক এই প্রাণীগুলিকে রাইফেলের পাল্লার বাইরে, বাইনোকুলারের কাঁচে পর্যবেক্ষণ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু আজকের দিনটির কথা স্বতন্ত্র। সিংহদমন অরিক্সের এ এক বিচিত্র রূপ—সিংহের মত তার সুদীর্ঘ লাঙ্গুল এবং প্রান্তদেশের রোমগুচ্ছ আন্দোলিত হচ্ছে অধীর উন্মাদনায়, পরিশ্রম এবং অবরুদ্ধ ক্রোধে বাদামী হলুদ চামড়ার উপর ফুটে উঠছে সুগঠিত পাঁজরের তরঙ্গ ; বুনো ঘোড়ার মত বলিষ্ঠ পেশীবহুল কাঁধ। একটি মাত্র সরলরেখায় স্থাপিত দু-দুটো বিরাট শিং, পাশ থেকে অন্তঃত সেরকমই মনে হল হেলভিনের।

খুব চেনা ঐ মুখ—কোথায় যেন একই রকম মুখের প্রতিচ্ছবি দেখেছেন তিনি! মনে পড়ল, মধ্যযুগের নাইট যোদ্ধাদের ঢালের উপর উৎকীর্ণ একশৃঙ্গ মৃগ "ইউনিকর্নের" মুখ। ইউনিকর্ণ তাহলে উপকথা নয়, বাস্তব। আর সেইসঙ্গে ছোটবেলার স্মৃতি হাতড়িয়ে আর একটি রূপকথার ছবি ভেসে উঠল

হেলভিনের মানসপটে। সিংহের সাথে যুদ্ধরত ইউনিকর্ণের ছবি। কি অদ্ভুত মিল!

কিন্তু খুব বেশীক্ষণ রূপকথার জগতে বাস করা সম্ভব হল না রয় হেলভিনের পক্ষে। আতঙ্কিত হেলভিন আবিষ্কার করলেন যে উন্মত্ত অরিক্সের দৃষ্টি তাঁদের প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে। স্ফীত নাসারন্ধ্র, জ্বলন্ত চক্ষু এবং মাথা পিছনে হেলিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে তিনি বুঝলেন গতিক সুবিধার নয়। হত্যার উন্মাদনা পেয়ে বসেছে ঐ "নিরীহ" জন্তুটাকে। সম্মুখে দুটি মানুষের উপস্থিতি এখন আর তার কাছে ভীতিপ্রদ নয়, বরং তার উন্মত্ত হত্যালীলার আগামী শিকার।

—"শিগ্‌গীর রাইফেল আনো, ততক্ষণ আমি এটাকে দেখছি।" আয়োমকে নির্দেশ দিলেন হেলভিন। বিগত কয়েকটি মুহূর্তের ঘটনাপ্রবাহ রয় হেলভিনের স্নায়ুযন্ত্রের উপর যে চাপ সৃষ্টি করেছিল, তার প্রভাবে তিনি স্থাণুরমত প্রান্তরের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। সাহেবের কথা শেষ হওয়ার আগেই আয়োম প্রাণপণে দৌড়ল ট্রাকের দিকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান আয়োমের দেহ লক্ষ্য করে দুরন্ত গতিতে ছুটে গেল প্রকাণ্ড অ্যান্টিলোপ।

মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফেললেন হেলভিন। অরিক্সের দৃষ্টি এড়িয়ে যে করে হোক আয়োমকে 'ট্রাকে' পৌঁছনোর সুযোগ করে দিতে হবে তাঁকে। আয়োম এবং হরিণটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে জন্তুটার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। মারাত্মক ঝুঁকি! কিন্তু এছাড়া আর কোন সহজ উপায় নেই। শেষ মুহূর্তে যদি অ্যান্টিলোপের গতিপথ থেকে হেলভিন সরে যেতে না পারেন তাহলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দুর্ভাগ্য আয়োমের। উন্মত্ত অরিক্স হেলভিনের দিকে মনযোগ দিল না, ঝড়ের মত তাঁর ডানদিক দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল অদূরে ধাবমান হতভাগ্য সুদানীটিকে লক্ষ্য করে।

পরবর্তী ঘটনা আমরা জানি। দুটি নিষ্ঠুর শিং-এর ক্রমাগত আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল আয়োমের দেহ। বীভৎস দৃশ্য! হেলভিন বুঝলেন যে, এবার তাঁর পালা। দৌড়ে পরিত্রাণ পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র, অন্ততঃ হতভাগ্য আয়োমের পরিণাম তাঁকে সেই শিক্ষাই দেয়।

একটু দূরে পড়ে আছে গাঢ় বাদামী রঙের হরিণটার মৃতদেহ, অর্দ্ধেক চামড়া ছাড়ানো। আর তার পাশে মাটির উপর ছাল-ছাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত বড় ছুরিটা হেলভিনের নজরে পড়ল। নীচু হয়ে ছুরিটা তুলে নিলেন হেলভিন, যদিও তিনি বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে অরিক্সের জোড়া সঙ্গিনের

বিরুদ্ধে সেটা তাঁকে কতটুকু সাহায্য করতে পারে। ছোরা হাতে উঠে দাঁড়াতেই ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন হেলভিন। তাঁর সামান্য নড়াচড়া জন্তুটার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। অরিক্সের রক্তচক্ষু তাঁর উপর স্থির। হাতে সময় খুবই অল্প। এক আশ্চর্য্য পরিকল্পনা নিলেন রয় হেলভিন।

ততক্ষণে খুব কাছে এসে পড়েছে ধাবমান অরিক্স। ঝটিতি মাটিতে শুয়ে পড়ে গুঁড়ি মেরে হেলভিন আশ্রয় নিলেন হরিণের মৃতদেহটার আড়ালে। ঝড়ের বেগে ছুটে এল শৃঙ্গধারী শয়তান। দুটি বিশাল ছুরিকার আঘাতে বিভক্ত হয়ে গেল মৃত হরিণের উদর। শুধু অল্পের জন্য হেলভিন বেঁচে গেলেন সে যাত্রায়। তীব্রগতি এবং ভরবেগের প্রাবল্যে অরিক্স হেলভিনকে অতিক্রম করে তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। এই ক্ষীণ সুযোগটুকু হাতছাড়া করতে চাইলেন না শ্বেতাঙ্গ শিকারী। তৎক্ষণাৎ আড়াল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে দৌড়লেন অদূরবর্ত্তী গাড়ীর উদ্দেশ্যে।

আয়োম ট্রাক-এ পৌছতে পারেনি। হেলভিন কি পারবেন! পিছনে ছুটে আসছে শরীরী মৃত্যু, রক্তলোলুপ হিংস্র অ্যান্টিলোপ।

গাড়ীটা ক্রমশঃ হেলভিনের নিকটবর্তী হচ্ছে। কাছে! আরও কাছে! আর মাত্র কয়েকফুট—তাহলেই নিরাপদ তিনি। একবার মনে হল প্রাণপণে সমস্ত শরীরটা নিয়ে লরির চারটি চাকার মধ্যবর্ত্তী জমির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেই চেষ্টা থেকে বিরত হলেন হেলভিন। প্রায় গাড়ীর কাছে এসে পড়েছেন আতঙ্কিত শিকারী, একবার মুহূর্তের জন্য মাথাটা ঘুরিয়ে পিছনে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন তিনি।

দশ থেকে বারফুটের মধ্যে এসে পড়েছে আনতশৃঙ্গ উন্মত্ত অ্যান্টিলোপ। শেষ মুহূর্তে জন্তুটার গতিপথ থেকে কোনক্রমে নিজেকে সরিয়ে আনলেন হেলভিন, কিন্তু ভুল করলেন শিং দুটোকে ধরে আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে। একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় তাঁর দেহ শূন্যপথে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছিটকে পড়ল মাটির উপর।

পতনের আঘাতে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল হেলভিনের চোখের সামনে, হাত এবং কাঁধের সন্ধিস্থলে অনুভব করলেন তীব্র যন্ত্রণা। চোখের সামনে ঝাপসা একটা বিরাট কাঠামোর অস্তিত্ব বুঝতে পারলেন তিনি। ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি পরিষ্কার হয়ে আসতে কাঠামোটার সঠিক স্বরূপ নির্ধারণ করলেন হেলভিন, —"সাফারী ট্রাক"। মস্তিষ্কের কোষগুলি পুনরায় কার্যক্ষম হয়ে উঠলে হেলভিন আরও বুঝলেন যে উন্মত্ত অ্যান্টিলোপের শিং তাঁকে গাড়ীর একপাশ থেকে

অন্তপাশে চালান করে দিয়েছে, অর্থাৎ তিনি শূন্তপথে গোটা গাড়ীটাই টপকে এসে মাটিতে ছিটকে পড়েছেন। তৎক্ষণাৎ, লাফিয়ে উঠে পড়ে হেলভিন দৌড়ে গাড়ীর মধ্যে আশ্রয় নিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি নিরাপদ। হেলভিনের মনে হল তিনি বোধহয় আনন্দে পাগল হয়ে যাবেন। কিন্তু অরিক্সটা গেল কোথায়! লরির অপর দিকে জানালা দিয়ে দেখলেন হেলভিন। ঐ তো! অদূরে আরোমের তালগোল পাকানো রক্তাক্ত মৃতদেহের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে শয়তান খুনীটা। রয় হেলভিন গাড়ীর মধ্যে রাখা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তুলে নিলেন।

রাইফেলের ভারী বুলেট অরিক্সের কাঁধের ঠিক নীচে মৃত্যুচুম্বন এঁকে দিল।

মাত্র আধ ইঞ্চির জন্য

আধ-ইঞ্চি! হ্যাঁ, মাত্র আধ-ইঞ্চি'

আর ঐ আধ-ইঞ্চির জন্যই মৃত্যু-বরণ করতে হল শ্বেতাঙ্গ শিকারী রবিনসনকে। যদিও তার মৃত্যুর জন্য তার নিজের গোঁয়াতুর্মিও অনেকাংশে দায়ী, তবু মাত্র আধ-ইঞ্চির লক্ষ্যভ্রষ্টতার জন্য বন্ধুর শোচনীয় মৃত্যুর কথা চিন্তা করেই উইলসনের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

প্রকৃত ঘটনার শুরু ব্রহ্মদেশের এক কাঠের গুদামে জনৈক ব্যক্তির একটা সামান্য ভুলকে কেন্দ্র করে, কিন্তু বর্তমানে আমরা ব্রহ্মদেশের পূবাঞ্চলে অবস্থিত একটি 'ক্লাব'-এর পটভূমি থেকেই আমাদের কাহিনী শুরু করব।

"বোহ্‌মিওর স্টেশন ক্লাব"—

বার্মা বা ব্রহ্মদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এই ক্লাবটিতে সেদিন বেশ জনসমাগম হয়েছিল একটি পার্টি উপলক্ষ্যে। ঐ পার্টিতে অন্যান্য অভ্যাগতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বনবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী মিঃ উইলসন এবং প্রতিবেশী একটি কাঠের গুঁড়ির গুদামের মালিক মিঃ রবিনসন। ব্রহ্মদেশে কাঠের গুঁড়ির ব্যবসা বহুল প্রচলিত এবং লাভজনক। কিন্তু রবিনসন শুধু ব্যবসাদার ছিলেন না, একজন আদৃত শিকারী হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট নামডাক ছিল।

পার্টি চলাকালীন সময়ে জনৈক তরুণ সামরিক অফিসার, শিকারে ঠিক কোন শ্রেণীর রাইফেল বা বন্দুক ব্যবহার করা শ্রেয় সে সম্পর্কে ঐ দুই অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতামত জানবার জন্য খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। স্বভাবতই, নবীন অফিসারটির শিকারের সখ ছিল প্রবল। শ্বেতাঙ্গ মিঃ রবিনসনকে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে অনুরোধ করা হলে, তিনি যে মত প্রকাশ করলেন তার সারমর্ম দাঁড়ায়, নিজের স্নায়ুযন্ত্র ও লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ থাকলে শিকারে সবসময়েই হালকা রাইফেল ব্যবহার করা উচিত। প্রসঙ্গক্রমে রবিনসন '৩০৩ বোরের রাইফেল ব্যবহারের কথা পর্যন্ত উল্লেখ করলেন। '৩০৩ আগ্নেয়াস্ত্র বড় জন্তু শিকারের পক্ষে অবশ্যই খুব হাল্কা যদিও ব্যবহারের পক্ষে যে কোন ভারী রাইফেলের থেকে অনেক সুবিধাজনক।

অপর শ্বেতাঙ্গ মিঃ উইলসন কিন্তু বন্ধুর এই মতে সায় দিলেন না। তাঁর মতে, অধিকাংশ নবীন শিকারী 'বড় জন্তু শিকারের ক্ষেত্রে নিজেদের স্নায়ুকে আয়ত্তে রাখতে পারেন না, অন্তত সম্পূর্ণভাবে তো নয়ই, ফলে সেসব ক্ষেত্রে হাল্কা রাইফেল ব্যবহারের ঝুঁকি যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। কারণ, হালকা আগ্নেয়াস্ত্র থেকে নিক্ষিপ্ত গুলি শিকারের মর্মস্থানে আঘাত না করলে প্রায় সবক্ষেত্রেই শিকারীকে নিজের প্রাণ দিয়ে তার সেই লক্ষ্যভ্রষ্টতার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। পক্ষান্তরে ভারী রাইফেলে—ব্যবহারের পক্ষে ততটা সুবিধাজনক না হলেও, শিকারী তার ভুল সংশোধন করার মত অন্তত আরেকটি সুযোগ পান, কারণ ভারী বন্দুকের গুলি শিকারের মর্মস্থানে আঘাত না করলেও সাময়িকভাবে তার আক্রমণকে অথবা আক্রমণের গতিকে স্তব্ধ করে দেয়। সেই সময়েই শিকারী তার সংশোধনের সুযোগ পেয়ে থাকে। ফলে যুক্তিযুক্ত কারণেই উইলসনের বক্তব্যে ভারী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার কথা সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হল।

—"স্নায়ুকে বশে এনে গুলি চালাতে না পারলে তাকে তো শিকারী বলে স্বীকার করাই কঠিন।" রবিনসনের ভারী গলায় উত্তেজনায় ছোঁয়া। স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, উইলসনের কথা তার ভাল লাগে নি।

—"কিন্তু আমার বক্তব্য ছিল শিক্ষানবিশদের ক্ষেত্রে; তাদের সম্পর্কেও কি তোমার একই মত?" ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ গলায় উইলসনের প্রশ্ন ভেসে এল টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে।

ততক্ষণে এই দুই অভিজ্ঞ শিকারীকে ঘিরে বেশ কয়েকজন উৎসুক ও কৌতূহলী ব্যক্তির ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেছে। সঙ্গত কারণেই, তাদের অধিকাংশের মত গেল উইলসনের বক্তব্যের স্বপক্ষে, কিন্তু তায় ফলে রবিনসনের মেজাজ চড়ে গেল সপ্তমে। ফলে, প্রাসঙ্গিক মত বিনিময়ের এখানেই সমাপ্তি ঘটল, এবং মিঃ রবিনসন তাঁর বন্ধুবরকে অনুরোধ জানালেন যে, তাঁকে প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়া হলে তিনি ঐ হাল্কা রাইফেলের সাহায্যেই সম্প্রতি 'গুণ্ডা' হয়ে যাওয়া হাতীটাকে শিকার করে তাঁর বক্তব্যের বাস্তব সত্যতা প্রমাণ করতে আগ্রহী। উইলসন বন্ধুর এই প্রস্তাবে সাগ্রহে তাঁর অনুমতি প্রদান করলেন কিন্তু রবিনসনের পরবর্তী কথাগুলোর জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না।

পার্টিতে আমন্ত্রিত অন্যান্য যেসব কৌতূহলী ব্যক্তি এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং নিজেদের মতামতও সুবিধামত ব্যক্ত করেছিলেন, তাঁদের

উদ্দেশ্য করে রবিনসন এবার বলে উঠলেন—"আশা করি এবার আমি আমার চিন্তাধারার সত্যতা বাস্তবে প্রমাণ করতে সক্ষম হব। মাত্র ·৩০৩ বোরের রাইফেলের সাহায্যেই আমি "গুণ্ডা" হাতীটাকে শিকার করব। আমার সাফল্য সম্পর্কে যদি কেউ সন্দিহান হন তাহলে তাঁর সঙ্গে আমি একশ' টাকা পর্যন্ত বাজী ফেলতে রাজী আছি।" রবিনসনের বক্তব্যে প্রচ্ছন্ন দম্ভের স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল, ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ কয়েকজন তাঁর ঐ বাজীর চ্যালেঞ্জ সানন্দে গ্রহণ করলেন।

চমকে উঠলেন উইলসন।

সর্বনাশ! এ কী ধরনের বাজী ধরছেন রবিনসন। ·৩০৩ বোরের রাইফেল সম্বল করে হাতীশিকার করতে যাওয়া তো একরকমের আত্মহত্যারই নামান্তর। বন্ধুকে এই সাংঘাতিক ঝুঁকি না নেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করলেন তিনি। কিন্তু রবিনসন অটল। শিকার সম্পর্কে ধারণাহীন এই লোকগুলোর আনাড়ী মন্তব্যের উপযুক্ত জবাব দিতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ফলে, কয়েকবার অনুরোধ করার পর নিজের সম্মানার্থে উইলসন বিরত হলেন।

ক্লাবের মধ্যে তখনকার মত চুপ করে গেলেও উইলসনের সেদিন সারারাত দুশ্চিন্তায় কাটল। হাজার হলেও রবিনসন তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ। সেই কারণে, পরদিন সকালেই উইলসন বন্ধুবরের মত পরিবর্তন করার জন্য তাঁর বাসগৃহের উদ্দেশ্যে চললেন। শেষবারের মত একবার চেষ্টা করতে দোষ কি? বলা যায় না, হয়ত ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে রবিনসন তাঁর মত পাল্টালেও পাল্টাতে পারেন।

কিন্তু গন্তব্যস্থানে পৌঁছে বন্ধুবরের দেখা মিললো না। পরিবর্তে হস্তগত হল একটি চিঠি। চিঠির বক্তব্য সরল। রবিনসন একজনমাত্র সঙ্গীকে নিয়ে ইতিমধ্যেই হাতীর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন। দিন সাতেকের মধ্যেই তিনি ফিরছেন। পশ্চাদ্ধাবন করা বৃথা, অতএব নিরাশ হয়েই ফিরতে হল উইলসনকে।

পাঠক-পাঠিকাকে আপাতত এইখানে রেখে আমরা পিছিয়ে যাব কয়েকটি মাসের ব্যবধানে ঘটনার গৌরচন্দ্রিকায়, কাহিনীর প্রাথমিক পর্যায়ে—

মাহুত মাউঙ-সেন-এর একটা ভুলের মধ্যে দিয়েই ঘটনার সূচনা। গণ্ডগোলটা সেই প্রথমে বাধায়।

"এলান স্মিথ" নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গের তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মদেশের একটি কাঠের গুঁড়ির গুদামে হস্তিচালকের কাজ করত মাউঙ-সেন। অভিজ্ঞ মাহুত মাউঙ-সেনের উপর শ্বেতাঙ্গ স্মিথেরও ছিল প্রগাঢ় আস্থা ও বিশ্বাস। কারণ তার মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা—তবু এই মাউঙ-সেনই ভুলটা করে বসলো মারাত্মকভাবে।

ঘটনাটা আপাতদৃষ্টিতে খুবই সামান্য—

সেদিন মাউঙ-সেনের মেজাজটা কোন কারণে সপ্তমে চড়ে ছিল। গুদামে এসে নিত্যনৈমিত্তিক কাজে যখন সে যোগ দিল তখনও তার মাথা বেশ গরম। হাতীটা সামান্য কিছু ভুল করলে বা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে সে জন্তুটার প্রতি অত্যন্ত নির্দয় ব্যবহার করছিল। এরই মধ্যে একসময় হঠাৎ একটা কাঠের টুকরো তুলে নিয়ে মাউঙ-সেন সজোরে আঘাত করে বসল জন্তুটার পায়ে নীচের দিকের নরম অংশে। হাতীটার এমন কিছু দোষ ছিল না। রাগ পড়ে যেত মাউঙ-সেনও বুঝলো যে লঘু দোষে এতটা গুরু দণ্ড দেওয়া তার পক্ষে ঠিক হয় নি। তখনকার মত কিছু ঘটল না বটে—কিন্তু হাতীর স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল অভিজ্ঞ মাহুতের বুঝতে বাকী রইল না যে, সে নিজেই নিজের কত বড় বিপদ ডেকে এনেছে। সে সাবধান হল!

মাউঙ-সেনের ধারণা যে অভ্রান্ত, মাস কয়েক পরের একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে তার প্রমাণ মিললো।...

হাতীটাকে খাবার দেওয়ার সময় সেদিন মাউঙ-সেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কাজ করতে করতে যেই সে হাতীটার দিকে পিছন ফিরেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই সামান্য সময়টুকুর মধ্যে, জন্তুটা তার বিরাট মাথা সামনের দিকে অল্প হেলিয়ে নিয়ে এক প্রচণ্ড আঘাতে হতভাগ্য মাহুতকে তার একটা দাঁতে গেঁথে ফেললো, এবং কোনোরকমের জানাজানি হওয়ার আগেই চম্পট দিল জঙ্গলের পথ ধরে।

'স্মিথ' নামক শ্বেতাঙ্গ তত্ত্বাবধায়কটি যখন এই দুর্ঘটনার খবর পেল তখন সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু বিমূঢ়ভাব কাটিয়ে উঠে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে কয়েকটি হাতী এবং প্রয়োজনীয় লোকজন যোগাড় করে নিয়ে ধাওয়া করলো খুনী হাতীটার পিছনে। স্মিথের এই সাময়িক বিহ্বলতার কারণও ছিল যথেষ্ট। প্রথমত, ঐ খুনী জন্তুটা ছিল গুদামের সবচেয়ে কর্মক্ষম আর দামী হাতী এবং দ্বিতীয়ত, মাউঙ-সেনের মত দ্বিতীয় একটি মাহুত খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর।

স্মিথের পক্ষে এই বিরাট ক্ষতি স্বীকার করে নেওয়া একটু কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। ফলে যতটা সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে হাতীটার খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়ল একটা গোটা দল। কিন্তু কাজটা অত সহজ হল না। পলাতক হাতীটার পায়ের ছাপ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল যে, দাঁতে গেঁথে নেওয়া মাউঙ-সেনের মৃতদেহ বহন করে হাতীটা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে এবং একটুও না থেমে। সুতরাং, অনির্দিষ্ট দূরত্বের পশ্চাদ্ধাবন পালা সাঙ্গ করে বাধ্য হয়েই 'স্মিথকে' তাঁবুতে ফিরতে হল দলবল নিয়ে।

ভোর রাত্রি···

স্মিথের ঘুম ভেঙে গেল তীব্র শাঁখের আওয়াজের মত হস্তীকণ্ঠের বৃংহণ ধ্বনিতে। সমাগত বিপদের ভয়াবহ আশঙ্কা নিয়ে স্মিথ তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসার পরমুহূর্তে উন্মত্ত হাতীর সঙ্গে সংঘাতে পাটকাঠি আর কাগজের তৈরী কাঠামোর মতো তাঁবুটা ভেঙে পড়ল। ভাগ্য ভাল, সামনে একটা বড় গাছ নাগালের মধ্যে পেয়ে গেলেন স্মিথ। গাছের উপরে এরই মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল একটি ব্রহ্মদেশীয় কুলী। সাহেবকে গাছে উঠতে দেখে সে হাত বাড়িয়ে উঠতে সাহায্য করল। তার সাহায্যে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি গাছে উঠে স্মিথ জীবনরক্ষা করলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কানে ভেসে এল একটা তীব্র আর্তনাদ। সূর্যের আলো তখনও ফোটেনি। দূরের গাছপালা স্পষ্ট চোখে পড়ে না। সেই আবছা অন্ধকারের মধ্যে এক বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়ল স্মিথ সাহেবের। অদূরবর্তী একটা গাছে উঠতে সচেষ্ট জনৈক হতভাগ্য বহু চেষ্টাতেও হাতীটার নাগালের বাইরে যেতে পারল না। ফলে···

না, বর্ণনা দেবার মত তেমন কিছু দেখেননি স্মিথ সাহেব। শুধু দেখলেন মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে একটি মানুষকে, এক দলা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে যেতে। জমির উপর শিকার পর্যাপ্ত সংখ্যায় পাওয়া যাচ্ছে না, এই কথাটা একটু পরেই খেয়াল হল হাতীটার এবং এবার সে নজর দিল বৃক্ষবাসী মানুষগুলোর উপর। প্রবল ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বিশাল গাছগুলো, কিন্তু বৃক্ষারোহী মানুষগুলোর সৌভাগ্যক্রমে উন্মত্ত দানবের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘাতের পরও তারা মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল। বহুক্ষণ চেষ্টার পর ব্যর্থকাম হয়ে অবশেষে 'গুণ্ডা'টা যখন জঙ্গলে ফিরে গেল, আকাশে তখন দুপুরের গনগনে সূর্য।

এই ঘটনার পরেই উপদ্রুত অঞ্চলে হাতীটা "নরঘাতক" হিসাবে পরিচিতি

লাভ করতে শুরু করল। বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত, বিয়োগান্ত ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ মাইল জায়গা জুড়ে তার কবলে প্রাণ হারাল বহু মানুষ। কিন্তু স্থানীয় শিকারীরা অথবা স্মিথ কেউ তার কোন নাগাল পেত না। নরখাদক বাঘের মতই জন্তুটা হয়ে উঠেছিল অসম্ভব চালাক।

প্রায় মাস আষ্টেক পরের ঘটনা। দাঁতালটাকে মারবার জন্য তখন বেশ মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা গুদাম-মালিকদের তরফ থেকে।

সেই সময় পূর্ব-ব্রহ্মের বোহ্‌মিও স্টেশন ক্লাবে একটি পার্টিতে বেশ কিছু আমন্ত্রিত ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল। উইলসন এবং রবিনসনও ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ঐ দুই শ্বেতাঙ্গ শিকারীর মধ্যে মত বিনিময় এবং পরবর্তী পর্যায়ে বাদানুবাদের কথা আমরা আগেই জেনেছি; এবং এখন সম্ভবত আমরা আঁচ করতে পারি যে কোন্ "গুণ্ডা" হাতীটার পশ্চাদ্ধাবন করে শিকার করতে বেরিয়েছিলেন রবিনসন।

সাতদিনের নোটিশ জারি করে বন্ধুকে চিঠি লিখে মিঃ রবিনসন তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন হাতীর খোঁজে। নিরাশ হয়ে দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে ফিরে এলেন উইলসন। কিই বা এখন করণীয় আছে তাঁর একমাত্র অপেক্ষা করা ছাড়া।

কাটলো একটি-দুটি-তিনটি দিন···

কোনো খবরই নেই রবিনসনের। অবশেষে চতুর্থ দিন সংবাদ নিয়ে এল বার্তাবাহক। উইলসন সে সময় তাঁর অফিসে কাজে ব্যস্ত। বার্তাবহনকারী ব্যক্তিটিকে চিনতেন উইলসন। রবিনসনের জনৈক সহকর্মী। অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে সে এসে জানাল যে, রবিনসনের তিন ভৃত্য স্ট্রেচারে করে যে ব্যক্তিটিকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে সে লোকটিই ছিল রবিনসনের হাতীশিকারের সঙ্গী। প্রচণ্ড আঘাতে তার সম্পূর্ণ দেহ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে। আর রবিনসন সম্ভবত নিহত হয়েছেন, যদিও ঘটনার পুরো বিবরণী তাঁর অজ্ঞাত।

উইলসনের স্নায়ুকেন্দ্রে একটা তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হল সাময়িক কালের জন্য। কিন্তু পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন তাঁর অভিজ্ঞ মন। বুঝলেন, মানসিক ভারসাম্য হারাবার সময় এটা নয়। ফলে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব দুই ব্যক্তি রওনা হলেন হাসপাতালের দিকে।

হাসপাতালে পৌছে ডাক্তারের কাছ থেকে উইলসন ও তাঁর সঙ্গী জানতে পারলেন যে, আহত ব্যক্তির অবস্থা খুবই সঙ্গীন। আঘাতের তীব্রতায় তার

দেহের নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতে সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিটিকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব। উপরন্তু, তার দেহের অভ্যন্তরে বহু ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছে। তবে, এখনো তার জ্ঞান রয়েছে—ইচ্ছা করলে তাঁরা দু'জন, রুগীর কাছ থেকে ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ জানতে পারেন।

উইলসনকে দেখে কাতর অনুরোধ জানিয়ে রবিনসনের সঙ্গী ব্যক্তিটি ঐ হাতীটাকে মারবার জন্য বারবার মিনতি করতে লাগলো। কারণ, তার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ হাতীটার উপর কোনো শয়তান অপদেবতা ভর করেছে। তার এই বিশ্বাস প্রমাণ করতে সে যে কাহিনীর বর্ণনা দিল, তা যেমন ভয়াবহ, তেমনই করুণ—

"টাটকোন" গ্রামের কাছ থেকে সে এবং রবিনসন গুণ্ডাটার পায়ের ছাপ খুঁজে পায়। কিন্তু সেদিনটা তাদের পুরোই ব্যর্থতায় কাটে, অর্থাৎ হাতীটার আর কোনো হদিশই পাওয়া যায়নি। সে রাত্রিটা গ্রামে কাটিয়ে পরদিন সকালেই আবার জন্তুটার পিছনে ধাওয়া শুরু হয়। প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে চলে এই পশ্চাদ্ধাবন-পর্ব...

দুই শিকারী ক্রমে প্রবেশ করেন ঘন ঘাসে ঢাকা তৃণভূমির মধ্যে। চারিদিকে মানুষ সমান উঁচু ঘনসন্নিবিষ্ট "এ্যালিফ্যাণ্ট গ্রাস"-এর জঙ্গল। বড়জোর দশ-বারো গজের মত সোজা দৃষ্টি চলে; ধীরে ধীরে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে এগোতে হচ্ছিল তাদের। এমন সময়ে হঠাৎ কোথা থেকে একটা মাছি উড়ে এসে পড়লো রবিনসনের চোখে। 'এ আপদ আবার কোথা থেকে এসে জুটলো এ সময়ে!' রবিনসন তাঁর সঙ্গীকে বললেন খুব তাড়াতাড়ি পোকাটাকে চোখ থেকে বার করতে। এমন সময়ে তাদের ডানদিকে একটু দূরে জেগে উঠলো এক ভয়ংকর বৃংহণধ্বনি! চোখ ফেরাতেই ঘাস-জঙ্গলের মাথার উপর দিয়ে দৃষ্টিগোচর হল ঝড়ের বেগে ধাবমান উন্মত্ত গজরাজের ক্ষিপ্ত মূর্তি। এক ঝটকায় রাইফেল টেনে নিয়ে গুলি চালালেন রবিনসন। স্থির লক্ষ্যে শিকারীর হাতের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠলো, ধাবমান অতিকায় জন্তুটাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু, বড় দেরী হয়ে গেছিল তাঁর। পরমুহূর্তে উন্মত্ত হাতীর একটা প্রকাণ্ড পায়ের তলায় পিষে গেলেন হতভাগ্য শিকারী। সঙ্গী প্রাণপণে দৌড়লো প্রাণ বাঁচাবার জন্য, কিন্তু ক্ষিপ্ত হাতীর শুঁড়ের প্রচণ্ড আঘাতে তার দেহ শূন্যপথে উড়ে গিয়ে পড়লো গজ-দশেক দূরে। হত্যার উন্মাদনায় উন্মত্ত হাতীটা আবার ফিরে গেল রবিনসনের দেহটার কাছে, তারপর প্রচণ্ড আক্রোশে শুঁড় এবং পায়ের সাহায্যে সেটাকে একটা

আকারবিহীন মাংসের দলায় পরিণত করল কয়েক মিনিটের মধ্যে। তারপর ফিরে চলে গেল জঙ্গলের পথে। কাহিনী শেষ করে থামলো রবিনসনের পঙ্গু সঙ্গী।

ততক্ষণে কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছেন উইলসন। সামরিক অফিসারটির সঙ্গে একটু পরেই তিনি রওনা হলেন ঐ "টাটকোন" গ্রামের দিকে। 'সঙ্গীর' জবানবন্দী মত ঐ গ্রামেরই অনতিদূরে খুনী হাতীটার কবলে প্রাণ হারিয়েছেন শ্বেতাঙ্গ শিকারী মিঃ রবিনসন। সুতরাং, আশা করা যায়, ধারে কাছেই 'খুনী'-টার সন্ধান মিলবে।

কিন্তু কাজটা যতটা সোজা ভেবেছিলেন উইলসন, বাস্তবে কিন্তু ঠিক ততটা সোজা হল না। দীর্ঘ সাতদিন ধরে ক্রমান্বয়ে "গুণ্ডা" হাতীটার পায়ের ছাপ ধরে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে দুই শিকারী 'খুনী'-টার সাক্ষাৎ পেলেন।

ঝড়ের মত আক্রমণ করলো নরঘাতক হাতী—কিন্তু, এবার তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে অগ্নিবর্ষণ করলো দু-দুটো ভারী রাইফেল। প্রথম গুলির প্রচণ্ড ধাক্কায় জন্তুটার আক্রমণের গতিপথ বেঁকে গেল। দ্বিতীয় গুলি হাঁটুতে লাগলো—হাতী হুমড়ি খেয়ে পড়লো সামনের দু'পায়ের উপর। তৃতীয় গুলি তার মর্মস্থান ভেদ করল। দাঁতালটার অতিকায় দেহ গড়িয়ে পড়লো বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে।

দুই শিকারী পরীক্ষা করে দেখলেন যে মাত্র আধ-ইঞ্চির জন্য রবিনসনের গুলি হাতীর মর্মস্থল ভেদ করতে অসমর্থ হয়। আর সেই বুলেট ছিল ·৩০৩ বোরের। অর্থাৎ, নিজের কথার খেলাপ করেননি রবিনসন!

আফিম

মালয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত সেলানগর উপদ্বীপ। আর এই উপদ্বীপকে বেষ্টন করে চলে গিয়েছে বারজুনটাই নদী। অন্যান্য ঋতুতে ধীরে প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী বলে মনে হলেও, বর্ষাকালে তরঙ্গ-ভয়াল খরস্রোতা এই নদীর ভিন্ন রূপ।

১৯২৭ সালের জুলাই মাসে, এই বারজুনটাই নদীর উপর একটি সেতু তৈরীর কাজ চলছিল। কাঠের গুঁড়ির উপর সাময়িকভাবে সেতুটার প্রাথমিক কাঠামো স্থাপন করা ছিল। এই কাজে কয়েকজন অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং অভিজ্ঞ চীনা কুলী নিযুক্ত করা হয়েছিল, এবং সমস্ত সেতুটির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন দুই শ্বেতাঙ্গ কুশলী ইঞ্জিনীয়ার—এস্‌সান স্মিথ এবং জনৈক রুশ—"ডি"। কাহিনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে স্মিথ সাহেবও ঐ রুশ ইঞ্জিনীয়ারের নাম গোপন করে গিয়েছেন, বিশেষ কোন কারণে তাঁকে ঐ "ডি" নামেই অভিহিত করেছেন পুরো ঘটনায়। এই রুশ ইঞ্জিনীয়ারটি বহুদিন চীনদেশে বসবাস করেছিলেন, ফলে স্থানীয় চীনা কুলীদের দিয়ে তিনি খুব ভালভাবে কাজ করিয়ে নিতে পারতেন এবং তাঁর নির্দেশ মতই তারা পরিচালিত হত। এস্‌সান স্মিথের তার ফলে বেশ খানিকটা সুবিধাই হয়েছিল। কিন্তু একটি ব্যাপারে মাঝে মাঝেই কাজ ব্যাহত হত। আর সেটি হল চীনা কুলীদের অহিফেনের প্রতি প্রবল আসক্তি। আফিমের ধূমপান, অর্থাৎ চলতি কথায় যাকে 'চণ্ডু' বলা যেতে পারে, স্থানীয় চৈনিক শ্রমিকরা সেই কড়া নেশা গ্রহণ করতে অত্যন্ত অভ্যস্ত ছিল। নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা মানুষকে দিয়ে তো আর কাজ হয় না, সুতরাং বাধ্য হয়েই দুই শ্বেতাঙ্গকে সেতুর কাজ বন্ধ করতে হত। মাঝে মাঝেই হয় স্মিথ সাহেব, নয় ঐ 'ডি' নামক ভদ্রলোক কুলীদের আস্তানায় হানা দিতেন এবং আফিম পেলেই তা বাজেয়াপ্ত করতেন—কারণ, তাঁদের ধারণা ছিল যে গরীব কুলীদের কাছ থেকে নেশার ঐ পদার্থটিকে বাজেয়াপ্ত করতে পারলে পয়সার অভাবে তাদের পক্ষে বার বার কিনে নেশা করা সম্ভব হবে না, ফলে কাজের মধ্যে এই মন্থরতার ভাব স্বাভাবিকভাবেই কমে আসবে। দুই শ্বেতাঙ্গের ধারণা ভুল নয়। ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন কুলীবস্তীতে হানা দেবার পর যদিও কুলীরা সতর্ক হয়ে গেল, কিন্তু নেশার ব্যাপকতাও হ্রাস পেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে—কাজও আশানুরূপ ভাবে চলতে লাগলো।

বারজুনটাই নদীগর্ভে সেদিন একটা বড় খুঁটি স্থাপন করার কাজ চলছিল। দুই শ্বেতাঙ্গই কাজের তত্ত্বাবধান করছিলেন। অকস্মাৎ 'ডি' নামধারী কৃশটির চোখে পড়ল দূরে নদীবক্ষে ভাসমান তিনটি সচল গোলাকৃতি বস্তুর উপর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেইদিকে স্মিথ সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। ততক্ষণে, ধীরে ধীরে নদীর উপর ভেসে উঠেছে সরীসৃপের অতিকায় দেহ। প্রথমটায় জলের উপর

দৃশ্যমান তার দুটো চোখ আর নাকের সম্মুখভাগই চোখে পড়েছিল রুশ ইঞ্জিনীয়ারের। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভাল যে, বারজুনটাই নদীতে কুমীর কোন নতুন বাসিন্দা নয়, মালয়ের বহু নদীর মত এখানেও মাঝে মাঝে ঐ অনড়-দৃষ্টি অতিকায় সরীসৃপের দেখা মেলে। সুতরাং, কুমীর দেখে আশ্চর্য হওয়ার মত ঘটনা কিছু ঘটেনি, কিন্তু নদীর উপর যে মুহূর্তে সম্পূর্ণ দেহটা ভেসে উঠলো, স্তম্ভিত বিস্ময়ে দুই শ্বেতাঙ্গ তাকিয়ে রইলেন সেইদিকে। স্মিথের মুখ থেকে নিজের অজ্ঞাতসারেই বেরিয়ে এল দুটি স্থানীয় শব্দ—"বেসার বুয়াইয়া", যার অর্থ দানব-কুমীর।

—"সত্যিই বিরাট কুমীর ওটা!" 'ডি' সম্মতি জানালেন সঙ্গীর কথায়।

—"কখনো শিকার করতে চেষ্টা করেছো?" প্রশ্ন করলেন স্মিথ, তাঁর চোখ দূরে নদীবক্ষে ভাসমান বিরাট সরীসৃপটার উপর নিবদ্ধ।

—"ওটা অসাধারণ ধূর্ত—বুনো মোষের মত", দৃশ্যমান প্রাণীটি সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করলেন 'ডি'। "তবে আজ সূর্যাস্তের আগে আলো থাকতে থাকতে একটা চেষ্টা করলে হয়।"

সঙ্গীর প্রস্তাব মন্দ ঠেকল না এন্সান স্মিথের। ফলে একটু পরেই দুই ইঞ্জিনীয়ার নদীর পাড় দিয়ে সতর্ক পায়ে এগিয়ে চললেন সেই দিকে, যেখানে আস্তানা গেড়েছে আমাদের পূর্বোক্ত সরীসৃপটা। খানিকটা পথ অতিক্রম করার পর পাতার ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ল, প্রায় শ-দুই গজ দূরে নদীর তীরবর্তী জমির উপর বিশ্রামরত কুমীরের দেহ। তার বিরাট চাবুকের মত লেজ ধীরে ধীরে আন্দোলিত হয়ে মাঝে মাঝে আছড়ে পড়ছে মাটির উপর। নদীর পাড়ে কালো মাটির সঙ্গে মিশে গেছে তার চামড়ার রঙ। অগ্রবর্তী 'ডি'-এর নির্দেশে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে এগোলেন স্মিথ। কুমীর এবং দুই শ্বেতাঙ্গ শিকারীর মাঝে নদীর একটা বাঁক। অতি সাবধানে নিঃশব্দে সেই বাঁকটা অতিক্রম করলেন দুই জনে।

'প্লপ্!'

মুখ তুললেন দুজনেই। কিছুদূরে ধীরে ধীরে জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে জলবাসী দানবের দেহ। শিকার হাতছাড়া হতে দেখে আড়াল ছেড়ে দুই শিকারী উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যখন নদীর তীরে গন্তব্যস্থলে এসে পৌছলেন তখন জলের মধ্যে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে "বেসার বুয়াইয়া"। নদীর তীরে ঐ জায়গায় কতকগুলো বড় বড় গাছ ঝুঁকে পড়েছে জলের উপর। ভালভাবে সমস্ত জায়গাটা

পর্যবেক্ষণ করে দুই শ্বেতাঙ্গ যখন নিরাশ হয়ে ফিরে চলেছেন, বারজুনটাই-এর জলে তখন অস্তমিত সূর্যের শেষ আভা লাল আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে।

এত সহজে হাল ছাড়লে চলে না। তাই ঐদিন রাত্রেই "সাম্পানে" চড়ে দুই শ্বেতাঙ্গ শিকারী বের হলেন কুমীরের খোঁজে। সঙ্গে নিলেন উচ্চশক্তির টর্চলাইট এবং রাইফেল। "সাম্পান" মালয়ে প্রচলিত এক ধরনের মজবুত নৌকা। তাতে চড়েই নদীবক্ষে দুই তত্ত্বাবধায়ক বেরিয়ে পড়লেন কুমীর-সন্ধানে।

টর্চের আলোর রেখা প্রথম কুমীরটাকে আবিষ্কার করলো সেতুর সাময়িক কাঠামোর ঠিক নীচে। কিন্তু না, সেটা তাঁদের অভিপ্রেত কুমীরটা নয়। অনাবশ্যক কুমীর শিকার করতে শিকারীদের আদৌ কোন আগ্রহ ছিল না। সুতরাং, সাম্পান এগিয়ে চলল। এরপর মাঝে মাঝেই টর্চের আলোতে ধরা পড়ছিল জোড়ায় জোড়ায় অনড় রক্তচক্ষু, কিন্তু আসলটার খোঁজ মিলল না। সারারাত ধরে অনুসন্ধান-পর্ব চালিয়ে প্রত্যূষে যখন তাঁরা ফিরলেন, তখন তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে একদল চীনা ও স্থানীয় কুলী। তাদের বক্তব্য অতি সহজ এবং সরল।

তাদের মতে, "তুয়ান বেসার" অর্থাৎ স্মিথ সাহেব এবং "তুয়ান কিচি", অর্থাৎ 'ডি' নামক রুশ ব্যক্তি যে কুমীরটাকে শিকার করবার চেষ্টা করছেন সেটি আদৌ কোন সাধারণ কুমীর নয়—ওটা আসলে নদীর দেবতারই সরীসৃপ রূপ। এর আগেও অনেক শিকারী ঐ বিশেষ কুমীরটাকে মারবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং, তারা যখন জানতেই পেরেছে, তখন তাদের অনুরোধ যে দুই 'তুয়ান' যেন আর ঐ চেষ্টা না করেন।

কিন্তু এরপরেও যখন 'তুয়ান'-দের মধ্যে ভাবান্তর এল না, উপরন্তু 'টোপ' হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তাঁরা যখন ঐ কুলীদের কাছেই একটা জ্যান্ত কুকুর তাঁদের জোগাড় করে দিতে বললেন, তখন তারা 'তুয়ান'-দের অনুরোধ রাখলো বটে কিন্তু বিশেষ খুশী হয়েছে বলে মনে হল না।

পরবর্তী অভিযানে দুই ইঞ্জিনীয়ার সাম্পানে চড়ে যেখানে এসে নামলেন কুমীরটা সেই জায়গায় দুপুরবেলা বিশ্রাম সুখ উপভোগ করতো। সঙ্গে যে কুকুরটাকে তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন সেই হতভাগ্য জন্তুটাকে সুবিধামত একটা জায়গায় বেঁধে রেখে দুই শিকারী রাইফেল হাতে আড়াল থেকে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

বেলা বাড়তে লাগল। জুলাই-এর গনগনে সূর্য যখন মধ্য আকাশে আগুন

ছড়িয়ে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ল, স্মিথ সাহেবের ঘড়িতে তখন বেলা দু'টো। কিন্তু তখনও, কুমীর তো দূরের কথা তার লেজের ডগাটুকুও চোখে পড়ল না। শিকারীরা উভয়েই তাঁদের ধৈর্য্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছেন, এমন সময় নদীর অপর পাড়ে জলের উপর ভেসে উঠল তিনটি কালো গোলাকৃতি পদার্থ। একবার দেখেই সিদ্ধান্তে এসে গেলেন এন্সান স্মিথ—কোন ভুল নেই, 'বেসার বুয়াইয়া'-ই গা ভাসিয়েছে নদীর জলে। উভয় শিকারী রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন অতিকায় জলবাসী দানবের জন্য। প্রায় মিনিট পাঁচেক জলের উপর স্থির হয়ে রইল তিনটি বিন্দু—একাগ্র দৃষ্টিতে কুমীর তাকিয়ে আছে কুকুরটার দিকে। তারপর হঠাৎ পুনরায় অদৃশ্য হল জলের তলায়। আর তাকে দেখা গেল না। বহুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে উঠে পড়লেন দুই শ্বেতাঙ্গ। ইঙ্গিতে দূরে অপেক্ষমান সাম্পান-চালককে নৌকা কাছে আনতে বললেন, তারপর কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন তাঁদের আস্তানায়। অফিসে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাল সহাস্যবদন একদল কুলী। তাদের হাবভাবে বোঝা গেল যে 'তুয়ান'-দের বিফলতা তাদের মোটেই বিস্মিত করেনি। বরং এটাই স্বাভাবিক তারা ধরে নিয়েছিল।

মধ্যাহ্নভোজ সমাধা করতে করতে উভয় শ্বেতাঙ্গই সিদ্ধান্তে এলেন যে, কুকুরের টোপ দিয়ে সরীসৃপটাকে সম্ভবত প্রলুব্ধ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং কুকুরটা কুলীদের ফিরিয়ে দিয়ে নতুন কোন ফাঁদের বা কৌশলের আশ্রয় নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে তাঁদের মনে হল।

পরের সপ্তাহে শনিবার। এক নতুন পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে দুই সঙ্গী কুমীরটার আস্তানায় হানা দিলেন। নদীর পাড়ে নেমে, প্রথমে বর্শার ফলার মত দু-মুখ ছুঁচোলো একটা আড়াই ফুট আন্দাজ লম্বা শক্ত গাছের ডালের সঙ্গে তাঁরা একটা লোহার তার বাঁধলেন। তারপর একখণ্ড ছাগলের মাংসের মধ্যে ডালটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে পুরো বস্তুটাকে জলের নীচে প্রায় দু-হাত মত ডুবিয়ে দেওয়া হল। তারের অপর প্রান্ত বাঁধা হল নদীর পাড়ে জলের উপর ঝুঁকে পড়া একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। সমস্ত ব্যাপারটা দাঁড়াল টোপ-সংলগ্ন একটা বিরাট বঁড়শির মত। অর্থাৎ, মাংসের খণ্ডটা উদরস্থ করতে গেলেই কুমীরের গলায় দু-মুখ ছুঁচোল গাছের ডালটা আটকে যাবে এবং তখন সরীসৃপটাকে গুলী করার যথেষ্ট সময় পাবেন শিকারীরা। উভয়েই আড়াল থেকে অপেক্ষা করতে লাগলেন কুমীরের জন্য, কিন্তু জুলাই মাসের প্রখর রৌদ্র যখন পশ্চিম

আকাশে সূর্যাস্তের স্নিগ্ধ কতকগুলো লাল রশ্মিতে পরিণত হল, তখনও কুমীরটার দেখা মিলল না।

অল্প সময়ের মধ্যেই অফিস থেকে বিকালের জলখাবারের পর্ব সেরে আবার শিকারীরা ফিরে এলেন পূর্বের স্থানে। কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি তাঁরা আবিষ্কার করলেন সেটি হল নদীবক্ষে ভাসমান টোপহীন বঁড়শি। তাঁদের এই স্বল্পসময়ের অনুপস্থিতির সুযোগেই ঘটনাটা ঘটে গেছে। সামান্য পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে স্মিথ সিদ্ধান্তে এলেন যে কাজটা স্থানীয় কুলীদের ছাড়া আর কারও নয়। আজ রাতের ভোজটা তাদের বেশ ভালই জমবে। 'ডি'-এর সন্দেহ কিন্তু অন্য—তাঁর ধারণা ধূর্ত কুমীরটাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। কিন্তু সঙ্গীর এই সিদ্ধান্ত অমূলক বলে স্মিথ যখন উড়িয়ে দিলেন, রুশ ব্যক্তিটি তখন অন্য প্রমাণের ব্যবস্থা করলেন।

আশেপাশের গাছগুলোর উপরে অনেক বানর অবস্থান করছিল, তারই একটাকে গুলি করে মেরে পুনরায় টোপের জায়গায় রেখে শিকারীরা স্থানত্যাগ করলেন। কিছু পরে ফিরে আসতেই দেখা গেল পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এবার স্মিথেরও আর সন্দেহ রইল না। বানরের মাংস আহারে কুলীরা অভ্যস্ত নয়, সুতরাং একাজ নিঃসন্দেহে কুমীরটার।

এই শিকার অভিযানের দিনকয়েক পরে, রুশ ইঞ্জিনীয়ারটির উপর কাজকর্ম তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার দিয়ে স্মিথ সাহেব জরুরী প্রয়োজনে কুয়ালালামপুরের হেড অফিসে চলে গেলেন। কয়েক দিনের মধ্যে কাজের চাপে কুমীরের ঘটনা তাঁর আর মনে রইল না। এরমধ্যে একদিন 'ডি' এসে জানালেন যে, বর্ষায় বারজুনটাই নদী ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে, এবং তাঁর আশঙ্কা সেতুর সাময়িক কাঠামো নদীর ঐ তীব্র স্রোত সামলাতে না পেরে যে কোন সময়ে ভেঙে যেতে পারে। কথাটায় স্মিথ সাহেব বিশেষ কোন আমল দিলেন না, কারণ তাঁর ধারণামত, বড় কোন ভূমিকম্পের সৃষ্টি না হলে ঐ কাঠামো ভাঙার সম্ভাবনা নেই। স্মিথের কথায় আশ্বস্ত হয়ে ফিরে গেলেন রুশ সহকর্মীটি।

কিন্তু মাত্র দিনকয়েকের মধ্যেই স্মিথের অফিসে তাঁর পুনরাগমন ঘটল। নাঃ! এবার কোন সেতু সংক্রান্ত ব্যাপারে নয়; এবারে তিনি নিয়ে এসেছেন এক আশ্চর্য খবর। বারজুনটাই নদীর "সরীসৃপ দেবতা" মারা পড়েছে! যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ! সুতরাং পুরো ঘটনার বিবরণ শুনতে উৎসুক স্মিথ

সাহেব তাঁর কৃশ সহকর্মীটিকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে এসে আশ্রয় নিলেন স্থানীয় একটি ক্লাবে।

'স্পটেড ডগ' ক্লাব।

ক্লাবের মধ্যে কফি পান করতে করতে 'ডি' যে রোমাঞ্চকর অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ দিয়ে গেলেন সেটি আমি নীচে তুলে দিলাম।

স্মিথ সাহেব সেলানগর থেকে চলে আসার পর ইদানীংকালে 'চণ্ডু'-র নেশা কুলীদের মধ্যে আবার ব্যাপকহারে চালু হয়েছিল। ফলে মাঝে মাঝেই কাজ ব্যাহত হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত একদিন অতিষ্ঠ হয়ে 'টিফিনের' সময় 'ডি' গিয়ে হাজির হলেন কুলীদের আস্তানায়। ঐ সময় যে তাঁর আগমন ঘটতে পারে সে সম্পর্কে কেউই ঠিক ধারণা করতে পারে নি, ফলে বেশ কয়েক পাউণ্ড আফিং-এর একটা বড় দলা অচিরেই 'ডি'-এর হস্তগত হল। কলাপাতায় মুড়ে ডেলাটা পকেটে ঢুকিয়ে 'ডি' স্থানত্যাগ করলেন।

বর্ষার জলে কানায় কানায় পূর্ণ বারজুনটাই নদী তখন উত্তাল, উদ্দাম, খর-স্রোতা। তীব্রবেগে ধাবমান নদীর জলে ভেসে চলেছে অসংখ্য কাঠের খণ্ড, ছোট-বড় গাছ, পাথরের বড় বড় টুকরো ইত্যাদি। আর সেই দুর্বার স্রোতে থর্ থর্ করে কাঁপছে সেতুর কাঠামো।

কুলীদের আস্তানা থেকে বেরিয়ে কৃশ ব্যক্তিটি ঐ সেতুর উপর ফিরে গিয়ে পুনরায় কাজের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হলেন। হঠাৎ, নদীর জলে ভেসে আসা প্রকাণ্ড একটা গাছের সঙ্গে সংঘাত হল নদীবক্ষে প্রোথিত একটা কাঠের খুঁটির। প্রচণ্ড ধাক্কায় থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো সেতুর কাঠামো আর 'ডি' যেখানে দাঁড়িয়ে কাজ পর্যবেক্ষণ করছিলেন, সেতুর সেই অংশটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল নদীর জলে।

তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ বারজুনটাই-এর দুরন্ত স্রোতে দক্ষ সাঁতারুর পক্ষেই টিঁকে থাকা কষ্টকর। কিন্তু, ভাগ্যক্রমে 'ডি' তাঁর হাতের নাগালে ভেঙে পড়া একটা চৌকোণা কাঠের কাঠামো পেয়ে গেলেন। ভারী কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী খাঁচার মত আকৃতি বিশিষ্ট সেই কাঠামোটাকে আশ্রয় করে ভেসে চললেন তিনি।

স্রোতে পাক খেতে খেতে, একজন যাত্রীকে বহন করে কাঠের কাঠামো শেষ পর্যন্ত পাড় স্পর্শ করল। কিন্তু জায়গাটা ঠাহর করে 'ডি' শিউরে উঠলেন। সর্বনাশ! এ তো 'বেসার বুয়াইয়া'-র বাসস্থল। কাঠের কাঠামোর মধ্যে বন্দী অবস্থায় 'ডি' পাড়ের যে জায়গাটিতে এসে পৌঁছেছেন, দিনকয়েক আগে এখানেই

বাঁধা হয়েছিল জ্যান্ত কুকুরটাকে। একটু পরেই সমস্ত চিন্তার অবসান হল। কাঠের খাঁচা থেকে বেরোবার জন্য 'ডি' সবে উঠে দাঁড়িয়েছেন, হঠাৎ একটু দূরে নদীর তীরবর্তী কালো মাটির একটা বিরাট অংশ যেন নড়েচড়ে তাঁর দিকে এগিয়ে এল। "দানব সরীসৃপ—বেসার বুয়াইয়া"। আতঙ্কে পাথর হয়ে জমে গেলেন 'ডি'।

ধীরে ধীরে অতিকায় সরীসৃপটা এগিয়ে এল কাঠের খাঁচাটার দিকে, তারপর হঠাৎ তার মুখটা দ্রুতবেগে ধাবিত হল 'ডি'-এর প্রতি। উন্মুক্ত মুখগহ্বরের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল ক্ষুরধার দাঁতের সারি। কিন্তু কুমীরের ভাগ্য বাদ সাধল। শিকারের নাগাল পাওয়া কুমীরের পক্ষে ঠিক অতটা সহজ হল না। আড়াআড়িভাবে আটকানো কাঠের তক্তায় আটকে গেল কুমীরের বিরাট চোয়াল। কিন্তু মুখের সামনে সহজলভ্য শিকারকে এই সামান্য বাধার জন্য ছেড়ে দিতে কুমীর রাজী নয়। 'প্রাণ-রক্ষক' কাঠের কাঠামো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল সরীসৃপের প্রচণ্ড আঘাতে। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়লেও, 'ডি' কিন্তু স্থাণু হয়ে বসেছিলেন না। প্রাণভয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি ক্রমান্বয়ে লাথি চালাচ্ছিলেন কুমীরের নাকে এবং মুখের সামনের দিকে নরম অংশে। ফলে মাঝে মাঝে সরীসৃপটা তার কুৎসিৎ মুখ টেনে নিচ্ছিল খাঁচার বাইরে।

এর মধ্যেই ঘটল সেই অদ্ভুত ঘটনা। প্রচণ্ডভাবে এলোপাথাড়ি হাত-পা ছোঁড়ার ফলে 'ডি'-র কোটের পকেট থেকে ছিটকে পড়ল কুলীবস্তি থেকে বাজেয়াপ্ত করা আফিমের ডেলা, তার পরই আর এক লাথিতে সেটা গড়িয়ে কাঠের খাঁচার বাইরে চলে গেল। 'ডি' ব্যাপারটা কতখানি খেয়াল করেছিলেন তা বলা কঠিন, কিন্তু কুমীর ডেলাটা বাইরে আসা মাত্রই গলাধঃকরণ করল, এবং তারপর পুনরায় মনোযোগ দিল তার শিকারের প্রতি।

অন্যদিকে 'ডি'-র পরিত্রাণের আশা ক্রমেই লোপ পাচ্ছিল। কারণ, আর কতক্ষণ জলবাসী দানবের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করে কাঠের কাঠামো টিঁকে থাকতে পারবে, সে সম্বন্ধে জোর করে কিছুই বলা যায় না। কুলীদের ডাকাও নিরর্থক। নদীর কল্লোলে ভেসে যাবে তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠ। অতএব, স্নায়ু এবং আত্ম-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় খুঁজে পেলেন না 'ডি'।

পরিত্রাণের আশা নেই। কিন্তু আতঙ্কিত 'ডি'-র কাছে কুমীরের আচরণ হঠাৎ কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক ঠেকল। ক্রমশঃ যেন নিশ্চল হয়ে আসছে অমিত শক্তির অধিকারী অতিকায় কুমীরটার আস্ফালন। তার সমস্ত দেহ যেন শ্রান্তিতে শুয়ে পড়তে চাইছে নদীর পাড়ে মাটির বুকে। বিদ্যুৎচমকের মত একটা সম্ভাবনার

কথা রুশটির মাথায় খেলে গেল। আর সেইসঙ্গে মুক্তির আলোও দেখতে পেলেন তিনি।

অল্পক্ষণ পরেই কুমীরটা আক্রমণে ইস্তফা দিল। তারপর আস্তে আস্তে তার প্রকাণ্ড শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেল নদীর পাড়ে। অসীম ক্লান্তিতে তার চোখ দুটো বুজে এল। আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে বারজুনটাই নদীর তীরে পড়ে রইল নদীর "সরীসৃপ দেবতা"।

একদৌড়ে 'ডি' যখন অফিসে এসে পৌঁছলেন, জলে কাদায় তখন তাঁর সর্বাঙ্গ মাখামাখি।

—'কুমীরটা এখনও আছে। আমার বন্দুকটায় গুলি ভরো।' এর চেয়ে বেশী কথা বেরুল না তাঁর মুখ দিয়ে।

সাম্পানে চড়ে গোটাকয়েক কুলী সঙ্গে নিয়ে 'ডি' যখন অকুস্থলে এসে পৌঁছলেন, তখনও নদীর পাড়ে জলবাসী দানবের বিরাট দেহ লম্বমান। জন্তুটার মাত্র দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে পরপর দুটো গুলি করলেন 'ডি'। তীব্র যন্ত্রণায় একবার মোচড় দিয়েই শান্ত হয়ে গেল কুমীরের দেহ।

কুমীরটা মৃত, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর কুলীরা নেমে এল সাম্পান থেকে। অবশ্য, সামান্য কিছুক্ষণ মৃতদেহটাকে পরীক্ষা করেই তারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে এটা সেই "নদীর দেবতা"-টা নয়, বরং তার ভাই হতে পারে !!!

সাগরের বুকে
চিড়িয়াখানা

"বাঘে-বলদে একঘাটে জল খায়।" রাজা-উজিরের প্রতাপ কতখানি তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে লোকের মুখে মুখে এই প্রবাদবাক্যটা প্রচলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু কেন বলা হল না "বাঘে-মানুষে একঘাটে জল খায়?" কারণটা ঠিক জানি না, তবে এইটুকু বুঝি যে, বাঘ এবং বলদে একসঙ্গে জল খাওয়াটা যখন এতই অপ্রচলিত ব্যাপার, অর্থাৎ, বলদের মত বলবান জন্তুই যখন বাঘের সঙ্গে জল খেতে বা কাছে ঘেঁষতে এত নিমরাজি, তখন মানুষের ক্ষেত্রে তো কোনো কথাই আসে না।

কিন্তু বাস্তব মাঝে মাঝে প্রবাদ অথবা গল্পকেও ছাড়িয়ে যায়। তাই, যদিও বন্য ব্যাঘ্র ও মানুষের একসঙ্গে পাশাপাশি জলপান করার কথা আমার জানা নেই, কিন্তু যদি আমি বলি বাঘে-মানুষে নির্বিবাদে দিব্যি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে মুক্ত হাওয়ায় ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করছে তাহলে হয়ত অনেকেই চমকে
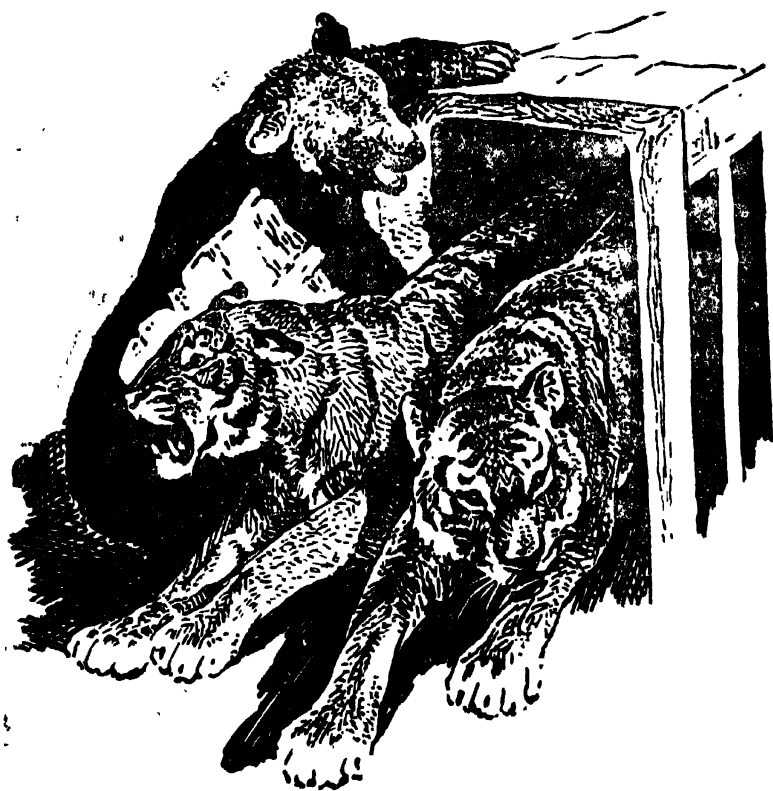
উঠবেন। আর ভ্রমণের পক্ষে স্থানটিও বড় মনোরম। আতলান্ত সাগরের বুকে ধাবমান একটি জাহাজের ডেক।

ঘটনাটা বিস্তারিতভাবে বলা যাক। কারণ, সেই আজব চিড়িয়াখানায় সেদিন শুধুমাত্র বাঘ আর মানুষই মুক্ত অবস্থায় ঘোরাফেরা করেনি, পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকটি চরিত্রকেও আমরা ক্রমশ আবিষ্কার করবো।

সন—ইংরাজী ১৯২৮। "এস্, এস্, ফোর্ডস্‌ডেল" নামে একটি জাহাজ লণ্ডন থেকে ছুটে চলেছিল আটলান্টিক মহাসাগরের বুক চিরে অস্ট্রেলিয়ার তটভূমির উদ্দেশ্যে। জাহাজের 'বিশেষ যাত্রী'-দের তালিকায় ছিল একজোড়া বিরাট ভাল্লুক, একটা অজগর সাপ, প্যান্থার, তুষারচিতা বা 'স্নো-লেপার্ড', বাঁদর, কতকগুলি ব্যাজার (ছোট ছোট মাংসাশী প্রাণী), কোকিল ও অন্যান্য কয়েক জাতের পাখি। আর ছিল দুটো পূর্ণবয়স্ক বাঘ।

জাহাজ ছাড়বার সময়ই খাঁচাগুলোর গড়ন ও কাঠামো বিশেষ সুবিধার ঠেকছিল না। কয়েকজন যাত্রী এমনকি স্বয়ং ক্যাপ্টেনও একবার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে, যাত্রাপথে জন্তুগুলো খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়ে অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাতে পারে। কিন্তু নাবিকরা তাঁদের আশ্বস্ত করল এই বলে যে, বিগত বহুকাল ধরেই এই খাঁচাগুলোতে করে বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ার পৃথিবীর বহু চিড়িয়াখানায় চালান দেওয়া হয়েছে এবং কোনো ক্ষেত্রেই কোনো বিপদ ঘটে নি। যাত্রীদের এবং ক্যাপ্টেনের ধারণা নিতান্তই অমূলক···

ঘটনার সূত্রপাত ঘটলো একদিন রাত্রে কয়েকটি ব্যাজারের মুক্তিলাভের মধ্যে দিয়ে। কি করে কে জানে, ব্যাজারগুলো তাদের খাঁচা ভেঙে সেই রাত্রে মুক্তিলাভ করে এবং অচিরেই কোকিলের খাঁচা আক্রমণ করে পাখীগুলোকে নির্বিবাদে পেটে চালান করে। সকালে পাখীর খাঁচায় কোকিলগুলোর ছড়ানো পালক দেখে হত্যাকারীদের খোঁজ পড়ে যায়, কিন্তু ভোঁদড়ের মত আকৃতিবিশিষ্ট ঐ হতচ্ছাড়া জানোয়ারগুলোকে ধরতে গিয়ে নাবিকদের বারবার নাজেহাল হতে হয়। এরই মধ্যে জনৈক নাবিক একটা গর্তের মধ্যে থেকে ব্যাজার ধরতে গিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে বসে। ক্ষুদে কিচ্ছুটা নাবিকটির মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এমনভাবে তাকে আঁচড়ে কামড়ে দেয় যে, লোকটি সঙ্গে সঙ্গে 'ব্যাজার' অনুসন্ধানে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয় এবং অচিরেই উপলব্ধি করে যে, এই ধরনের অসম্ভব পাজী জন্তু-জানোয়ার ধরা কখনই নাবিকদের কর্তব্যকর্মের মধ্যে পড়ে না।

এই ঘটনা যখন ঘটে তখন 'ফোর্ডস্‌ডেল' ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে ভারত মহাসাগরের বুকে পাড়ি জমাতে।

ভারত মহাসাগরের উষ্ণ জলবায়ুতে শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীদের কিছুটা অস্বস্তি হওয়ারই কথা। ফলে ভারত মহাসাগরের দিগন্তবিস্তৃত নীল জলের উপর দিয়ে জাহাজ যখন এগিয়ে চলেছে তখন জাহাজের অভ্যন্তরে দু'জন যাত্রী বেশ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। দু'জনই শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী—দু'টি বিরাটকায় ভাল্লুক।

উষ্ণ অঞ্চলের আবহাওয়ায় অনভ্যস্ত ভালুক দু'টো ক্রমান্বয়ে অশান্ত হয়ে উঠতে লাগল এবং বারবার আঘাত করতে লাগল খাঁচার নড়বড়ে শিকগুলোর উপর। অমিতশক্তির অধিকারী দুই বিপুলদেহ বন্য প্রাণীর ক্রমাগত আঘাতে ধীরে ধীরে খাঁচার প্রতিরোধ ক্ষয়ে আসতে লাগল এবং এই ঘটনার পরিসমাপ্তি হল একটি রাতে, যেদিন ডেকের উপর "চার্ট" দেখতে ব্যাপৃত জনৈক নাবিকের দেখা হয়ে গেল অদূরে সঞ্চরণশীল দুটি বিপুলবপু ছায়ার সঙ্গে। মুহূর্তপূর্বের মনো-সংযোগ ছিন্ন করে এবং চার্ট সম্পর্কে নিতান্ত উদাসীন হয়ে সে যে গতিবেগ এবং দেহ-সৌষ্ঠবের সৃষ্টি করে দৌড় দিল, সেটি দৌড়বীরদের আদর্শ হতে পারতো।

এক দৌড়ে সে যখন উপরের ডেকে এসে পৌঁছল তখন জাহাজের একজন মেট সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অতীতের কোনো সুখকর স্মৃতির রোমন্থন করছিল—সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছিল একহাতে ধরা কফির পেয়ালায়। মোট কথায়, সে একটা অলস, কর্মহীন পরিবেশকে বেশ একা একা উপভোগ করছিল। এমন সময়ে বেগে ধাবমান ব্যক্তিটি এসে তাকে ঐ ভাল্লুক দু'টোর কথা জানাল! 'সাংঘাতিক ব্যাপার—বলে কি!' এখনই কোনো একটা কিছু ব্যবস্থা নেওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করলেন মেট।

কিন্তু সেই কাজে এগোতে গিয়েই বিপত্তি ঘটলো। অপস্রিয়মান মানুষটির পিছু পিছু একটা কৌতূহলী ভালুক চলে আসছিল উপরের ডেকে—ডেকের সিঁড়ির উপরই তার সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে গেল মেট-এর। ভাল্লুকটার কাছে সম্ভবত, আলাপ পরিচয়ের প্রাথমিক পর্বটা সেরে নেওয়া ভদ্রোচিত বলে মনে হয়ে থাকবে। কিন্তু সে দু-এক পা এগোতেই ডেকের উপরে মেট ভদ্রলোক যেভাবে 'আস্ত ডিমের পোচ মার্কা' দু-দুটো গোল গোল বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন যে, ভালুককে হতাশ হতে হল।

সে অত্যন্ত নিরাশ হয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে তার সঙ্গীর সাথে মিলিত হতে চলে গেল।

ততক্ষণে জাহাজের বিপদসূচক ঘন্টি বেজে উঠেছে। নাবিকরাও প্রায় সবাই এসে ডেকের উপর জড়ো হয়েছে মুক্ত ভালুক দুটোকে দেখবার আগ্রহে।

ভাল্লুকের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই, বোধকরি এই বিষয়ে খুব কম লোকই পড়াশুনা করেছেন। সুতরাং সঠিক করে কিছুই বলা সম্ভব নয়। তবু যতদূর মনে হয় ডেকের উপর অতগুলো লোকের সমাবেশ তাদের কাছে ভাল ঠেকছিল না। ফলে মুক্তি যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা দুটো বাঘ, দুটো বিরাট বিরাট ইঁদুর, বেশ কয়েকটা বানর এবং অন্যান্য আরও কয়েকটা জন্তুকে বন্ধন দশা থেকে মুক্তি দিল। বোধকরি তারা বুঝতে পেরেছিল যে, যত জন্তু মুক্তিলাভ করবে, নিজেদের মুক্ত বিচরণের সময়সীমাও তত দীর্ঘতর হবে…

ঐ দিনই বিকেলের দিকে ঘটলো আরেক অঘটন। জাহাজের একজন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী সেই সময় জাহাজের ডেকের উপর পায়চারী করছিলেন। এমন সময়ে গুটি গুটি পায়ে তাঁর সঙ্গে সখ্যতা পাতাতে একটি সদ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত বাঘের সেখানে আবির্ভাব ঘটে। বাঘের মতলব বিশেষ খারাপ ছিল না। কিন্তু শার্দুল সন্দর্শনে ভদ্রলোক অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে কোমরের খাপ থেকে রিভলবার টেনে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বাঘটার উদ্দেশ্যে গুলি চালালেন। গুলির নিশানা কতদূর নির্ভুল ছিল সে প্রসঙ্গে পরে আসছি, কিন্তু ভদ্রলোকের এই ব্যবহারে বাঘটি অত্যন্ত বিরক্ত হল, এবং 'মানুষ' নামক জীবটি যে অত্যন্ত হীনচেতা ও অভদ্র সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করল। পরে খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছিল যে, বাঘটির উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত গুলিতে জাহাজেরই একটা বিড়ালের দেহান্তর ঘটেছিল। ভদ্রলোকের এলেম আছে!

ইতোমধ্যে জাহাজের নাবিকরা সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল মুক্তিপ্রাপ্ত জন্তুগুলোকে ধরার জন্য। দুই ভদ্রলোক—মিঃ দেওয়ার এবং জাহাজের জনৈক কর্মচারীর প্রচেষ্টায় বাঘ এবং ভালুকদের ধরা হল। প্রথমে জাহাজের কারিগরকে দিয়ে আগেরগুলোর চেয়ে অনেক শক্ত এবং টেঁকসই খাঁচা বানানো হল। তারপর জাহাজের কর্মচারীটির পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে বাঘ দুটিকে রসালো ভেড়ার মাংসের টোপ দিয়ে প্রলুব্ধ করে আটকানো হল, এবং তারপর নাবিকদের সাহায্যে মিঃ দেওয়ার ভালুক দুটোকে ধরলেন দড়ির ফাঁস দিয়ে। এই চারটে জন্তুকে

আটকে জাহাজের নাবিকরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বিপজ্জনক পরিস্থিতি কাটানো গেছে।

অন্যদিকে কতকগুলো বাঁদর পাখীর খাঁচা ভেঙে সেগুলোকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, কিন্তু বাঘ-ভালুকের দিকে মনোযোগ থাকার জন্য এই সামান্য ঘটনাটা বিশেষ কেউই লক্ষ্য করলো না। সে যাই হোক, ক্রমে ক্রমে সবকটা ছোটখাট জন্তুকেই ধরা হল—কেবল ধরা পড়ল না একটা বাঁদর। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও যখন ঐ লক্ষ্মীছাড়া প্রাণীটাকে ধরা গেল না, তখন ক্যাপ্টেন বেশ বিরক্ত হয়েই 'জীবিত অথবা মৃত' যে কোনো অবস্থায় সেটাকে ধরার জন্য আদেশ জারি করলেন।

তখন পূবের আকাশে সবে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। জলপোত "এস্. এস্. ফোর্ডস্ডেল" ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে অস্ট্রেলিয়ার তটভূমির দিকে। ঘড়িতে তখন ভোর চারটে। মিঃ দেওয়ার ও জাহাজের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ডেকের উপর দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। হঠাৎ জাহাজের উল্টোদিক থেকে ভেসে এল এক প্রাণান্তকর চীৎকার এবং একটু পরেই আবছা আলোতে তাঁদের দৃষ্টি-গোচর হল দ্রুতবেগে ধাবমান একটি সাদা এ্যাপ্রন ও টুপী—জাহাজের বাবুর্চী! ভয়ার্ত কণ্ঠে আর্তনাদ করতে করতে সে ঐ দুই ব্যক্তির দিকেই ছুটে আসছে। কাছে আসতে আর্তনাদ শব্দে রূপান্তরিত হলো—ক্রমান্বয়ে সে চীৎকার করে চলেছে—ভূত! ভূত!...

'—ভূত! ভূত কোথায়!' বেশ একটু আশ্চর্য হলেন মিঃ দেওয়ার ও তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোক। —"আজ্ঞে হ্যাঁ! আমি যখন প্রাতঃরাশ বানাতে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলাম তখনই ভূতটাকে প্রথম দেখতে পাই। আমাকে দেখেই ভূতটা তেড়ে এলো, আমি কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি", আতঙ্কিত স্বরে তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয় বাবুর্চীটি।

একটু একটু ভয় যে করছিল না, সে কথা বললে ভুল হবে। কিন্তু উভয় ব্যক্তিই ভূতের সন্ধানে যাত্রা করলেন। বেশিদূর এগোতে হল না, দূর থেকে তাঁদের চোখে পড়লো ডেকের উপর সঞ্চরণশীল কোনো 'কিছুর' উপর। অন্ধকারে তার অবয়ব প্রায় অদৃশ্য; একমাত্র জলন্ত চোখ দুটো ছাড়া। বাবুর্চীর ভয় অমূলক নয়। তবু সাহসে ভর করে এগিয়ে গেলেন মিঃ দেওয়ার। সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট লাফে ভূতটা ডেকের একপ্রান্তে এসে পড়লো আর তারপরই তরতর করে মাস্তুল বেয়ে উঠে গেল বহু উর্ধ্বে। এতক্ষণে ভূতের রহস্য পরিষ্কার হল দু'জনের কাছে। ভূত আর কেউ নয়। হতচ্ছাড়া বাঁদরটা।

মিঃ দেওয়ার ডেকের উপর থেকে কয়েকটা কাঠের টুকরো সংগ্রহ করে মাস্তুল বেয়ে খানিকটা উঠে গেলেন। তারপর বানরটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগলেন ঐ কাঠের খণ্ডগুলো। প্রথম আর দ্বিতীয়টা লাগলো না বটে, কিন্তু তৃতীয় টুকরোটা গিয়ে সজোরে আঘাত করল বাঁদরটার গায়ে। বেশ জোরেই টুকরোটা ছুঁড়েছিলেন মিঃ দেওয়ার, ফলে লক্ষ্যবস্তু স্থানচ্যুত হয়ে সোজা ডেকের উপর পড়তে লাগলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভূপতিত হল না বাঁদরটা। দেওয়ার মাস্তুলের যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলেন, ঘটনাচক্রে সেইখানে একটা লোহার শিক সোজা বেরিয়ে এসেছিল মাস্তুলের গা থেকে। সেই বেরিয়ে থাকা লোহার দণ্ডটা ধরে নিয়ে নিজের 'অধঃপতন' রোধ করল বানরটা! পরক্ষণেই, মিঃ দেওয়ার কিছু বুঝবার আগে তাঁরই হস্তগত একটি কাঠের টুকরো কেড়ে নিয়ে তাই দিয়ে পাজী জানোয়ারটা সজোরে আঘাত করলো তার আততায়ীকে, আর সেই সঙ্গে দেওয়ারের গালের উপরও এসে পড়ল এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত। এবার আর সহ্য হল না মিঃ দেওয়ারের। বাঁদরের হাতে এই নিগ্রহ তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে দিল। ফলে তিনিও হতভাগা বাঁদরটার গালে কসিয়ে দিলেন এক বিরাশি সিক্কার চড়। চড়ের ওজনটা নেহাত মন্দ ছিল না। এরপর শুরু হল বানর আর মানুষে পারস্পরিক চপেটাঘাত পর্ব। এই সুযোগে দেওয়ারের অপর সঙ্গী মাস্তুল বেয়ে উঠে চট করে ধরে ফেললেন বাঁদরটাকে, তারপর উভয়ে মিলে তাকে নামিয়ে এনে খাঁচায় বন্দী করলেন।

ঘন্টা কয়েক পরে ফ্রিমেনটেল বন্দরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করল জলযান "এস্. এস্. ফোর্ডস্ডেল"।

আবগারী বিভাগের কর্মচারী প্রশ্ন করলেন জাহাজের ক্যাপ্টেনকে। সেই সনাতন প্রশ্ন—"যাত্রাপথে কি কোন অসুবিধার কারণ ঘটেছিল?"

—"তা কিছুটা হয়েছিল বলতে পারেন", স্বাভাবিক স্বরেই উত্তর দিলেন ক্যাপ্টেন, "ঐ কয়েকটা জন্তু খাঁচা ভেঙে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল, সেগুলোকে আবার আমাদের ধরে খাঁচায় পুরতে হয়েছে।"

'বোগোর' কথাটি স্থানীয়, যার আক্ষরিক অর্থ 'ছন্নছাড়া'।

জাভাদ্বীপে অবস্থিত পূর্বোক্ত 'বোগোর' শহরের উপকণ্ঠে একটি চা-বাগিচা সংলগ্ন অতিথিশালা একটু নজর করলে হয়ত অনেকেরই চোখে পড়বে। ১৯৪২ সালে জাপানী আক্রমণের সময় টেরি মাইকেল ঐ বাড়ীটা ছেড়ে চলে আসেন। গোটা জাভাদ্বীপ জুড়ে তখন চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা। কিন্তু অতিথিশালাটিকে অত সহজে ভুলতে পারলেন না মাইকেল। পরবর্তী জীবনে যখনই ঐ বাড়ীটা তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে, মাইকেল অনুভব করেছেন তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাচ্ছে একটা হিমশীতল আতঙ্কের স্রোত!

না, বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা নয়, অতিথিশালার পূবদিকে ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো রুক্ষ খসখসে একটা চামড়াই ঐ আতঙ্কের কারণ—

সর্বাঙ্গে অজস্র ছোট ছোট গুটি বসানো চামড়াটা লম্বায় প্রায় বারো ফুটের উপর; মধ্যভাগে দেহের বিস্তৃতিও নেহাত কম নয়—দুই বাহু দুইদিকে সম্পূর্ণ প্রসারিত করলে একটি মানুষ কোনক্রমে নাগাল পেতে পারে।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে দেহ-সংলগ্ন চারটি পা—

কুমির বা অন্যান্য সরীসৃপদের সঙ্গে পা-গুলোর বিশেষ মিল চোখে পড়ে না, বরং প্রাগৈতিহাসিকদের নখর-ভয়াল থাবার সঙ্গেই সেগুলোর সাদৃশ্য অনেক বেশী।

যে কোন সাধারণ মানুষই এক নজরে বলে দেবে ওটা কুমির অথবা সাপের চামড়া নয়। কিন্তু ঐ অত্যাশ্চর্য দেহচর্মের সত্যিকার মালিককে আবিষ্কার করতে গেলে অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই মস্তিষ্ক হবে ঘর্মাক্ত!

তাহলে ঐ অদ্ভুত সংগ্রহটির পরিচয় কী?

টেরি মাইকেলের ভাষায়, 'বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে প্রস্তরদ্বীপের বুকে ওরা আজও ঘুরে বেড়ায়—সভ্যজগতের বিস্ময় অতিকায় হিংস্র ড্রাগনের দল!'

বিস্ময়কর সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী—

পূর্ব আফ্রিকায় শিকারের পর্ব চুকিয়ে ম্যানিলা যাওয়ার পথে শিকারী টেরি মাইকেল জাভা দ্বীপে দিন কয়েকের জন্য জনৈক চা-বাগিচা মালিকের অতিথি হয়েছিলেন। চা বাগানের মালিকের নাম ভ্যান এফেন—জাতে ওলন্দাজ। আড়ে বহরে বিশাল ঐ ভদ্রলোকটির চেহারা ছিল দেখবার মতো। যেদিন ভ্যান এফেন-এর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন টেরি মাইকেল, সেদিনই সন্ধ্যাবেলা তিনি এফেন-এর সঙ্গে কফি পান করতে করতে সেখানকার দ্বীপপুঞ্জগুলির বন্য জীবন নিয়ে আলোচনা করছিলেন। স্থানীয় প্রসঙ্গের আলোচনার মধ্যে দিয়ে এফেনই কথাটা বললেন—

উনবিংশ শতকের শেষভাগে তাবৎ পৃথিবীর জীবতাত্ত্বিকরা জীবজগতের সমস্ত জাতি এবং প্রজাতিগুলিকে তালিকাভুক্ত করার প্রচেষ্টা চালান। যদিও কিছু কিছু বিশেষ ধরনের পাখি অথবা অজানা কীটপতঙ্গ কিংবা ছোটখাট সাপ-টাপ নতুন-ভাবে আজও আবিষ্কৃত হচ্ছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বৃহৎকায় প্রাণীদের কোন বিশেষ গোষ্ঠী আর অনাবিষ্কৃত ছিল না—বৈজ্ঞানিকদের দল সারা পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান প্রায় সব কয়টি বৃহৎ প্রাণীকেই আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন।

যদিও ঐ সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরের 'ফ্লোরস' দ্বীপমালার নিকটবর্তী স্থানীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে 'ড্রাগন' নামক একধরনের অদ্ভুত প্রাণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে 'গুজব' চালু ছিল, কিন্তু উক্ত অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদের কাছে প্রসঙ্গটি অবসর বিনোদনের সময় হাসির খোরাক জোগানো ছাড়া আর কোন গুরুত্বই পেত না। 'ফ্লোরস' দ্বীপমালাটির ভৌগোলিক অবস্থান ছিল জাভার পূর্বদিকে বালিদ্বীপ ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে 'টিমর' দ্বীপের কাছাকাছি। জাভার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্বপ্রান্তে একটি দ্বীপমালা গঠিত হয়েছে 'বালিদ্বীপ', 'ফ্লোরস' প্রভৃতি ছাড়া বেশ কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টিতে—মানচিত্রে ঐ ছোট ছোট ভূখণ্ড-গুলোর প্রায় কোন হদিশই মেলে না।

ঐ অখ্যাত ক্ষুদ্র দ্বীপগুলির একটির নাম 'কোমোডো'। স্থানীয় জনশ্রুতিতে এই দ্বীপটিকেই অতিকায় মাংসাশী ড্রাগনদের মূল বাসভূমি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

গুজব, জনশ্রুতি, লোককথা ইত্যাদি অত্যন্ত সংক্রামক। আর সেই সংক্রমণের প্রভাবেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে পূর্বে উল্লিখিত দ্বীপগুলিতে সত্যি সত্যিই একটি অনুসন্ধান দল পাঠানো হয়।

দিন কয়েকের মধ্যেই কোমোডো এবং তার আশেপাশের ছোট ছোট ভূখণ্ড-গুলিতে পরিক্রমা শেষ করে ফিরে এলেন অভিযাত্রী বৈজ্ঞানিকদের দল। সঙ্গে নিয়ে এলেন এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর তথ্য। সেই তথ্যের সারমর্ম হল যে, 'কোমোডো' এবং তার প্রতিবেশী ছোট ছোট দ্বীপগুলির বুকে দলে দলে বিচরণ করছে বিচিত্র একধরনের প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ এবং যার কোন খবরই আধুনিক জীববিজ্ঞান রাখে না।

ফলে, ১৯১৪ সালে জীবতত্ত্বের তালিকায় বারো ফুট দীর্ঘ, দুশ পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের এক দানব গিরগিটির পরিচয় লিপিবদ্ধ হল। বিজ্ঞানীরা নামকরণ করলেন **'Giant Monitor'** বা 'অতিকায় গো-সাপ'।

বর্তমান পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান সরীসৃপগোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রজাতি।

এই চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ প্রাক্-ইতিহাস যুগের এই দুর্লভ গোষ্ঠিটিকে সংরক্ষিত রাখার জন্য সচেষ্ট হলেন। কারণ, পেশাদার অথবা সখের শিকারীদের হাতে প্রাণীগুলোর জীবনসংশয় ঘটার যথেষ্ট কারণ ছিল।

শেষ পর্য্যন্ত, বিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে পুনরায় একটি অভিযাত্রী দলকে কয়েকটি 'জীবন্ত ড্রাগন'-এর নমুনা সংগ্রহের জন্য কোমোডো দ্বীপে প্রেরণ করা হয় এবং বহুকষ্টে কয়েকটি অতিকায় সরীসৃপকে ধরা সম্ভব হয়। জন্তুগুলো এখন আমেরিকা এবং ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষের বিস্ময় উৎপন্ন করছে—

ভ্যান এফেন চুপ করলেন। ঘরের জানালাপথে দূরে দৃশ্যমান রত্নমালার মত আলো ঝলমলে 'বোগোর' শহর। এফেন-এর দৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ। কফির পেয়ালা হাতে ভ্যান এফেনের বিরাট দেহটা এক রহস্যময় ছায়ামূর্ত্তির মত মনে হল টেরি মাইকেলের। মাইকেলের মুখেও কথা নেই, কিন্তু তার নির্বাক অস্তিত্বের অন্তঃস্থলে শিকারী সত্ত্বা ততক্ষণে সজাগ হয়ে উঠেছে রোমাঞ্চকর এক অভিযানের গন্ধ পেয়ে।

পৃথিবীর বুকে প্রস্তরদ্বীপের অন্তরালে আজও বিচরণ করে বেড়াচ্ছে প্রাগৈতি-

হাসিক ভয়ংকর সরীসৃপের দল—'ড্রাগন'। যে করেই হোক অন্ততঃ একবারের জন্য হলেও মাইকেলকে পৌঁছতে হবে তাদের আস্তানায়, তবেই সফল হবে তাঁর শিকারী জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন...

ভাগ্য ভাল টেরি মাইকেলের। অভিযানের অনুমতি পাওয়ার জন্য তার বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল না। অবশ্য তার কারণও ছিল। মহাযুদ্ধের রণদামামা তখন বাজতে শুরু করেছে গোটা মহাদেশের বুক জুড়ে, ফলে ঐ গিরগিটিগুলোর কথা চিন্তা করার মতো সময়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে খুব বেশী ছিল না।

শুধু ক্যামেরা নয়, রাইফেল সঙ্গে নেবারও অনুমতি পেলেন মাইকেল। অবশ্য শর্ত ছিল যে, কেবলমাত্র আত্মরক্ষার তাগিদেই তিনি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করবেন।

অনুমতি পাওয়ার পর আর অপেক্ষা করার মত ধৈর্য বা ইচ্ছা কোনটাই টেরি মাইকেলের ছিল না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা স্টীমারে চড়ে দিনকয়েকের মধ্যে তিনি এসে পৌঁছলেন 'মাও মেয়ার' উপসাগরের তীরে "পুলো বেসার" দ্বীপখণ্ডে। এই দ্বীপটির অবস্থিতি ছিল ফ্লোরস-এর উত্তর উপকূলবর্তী অঞ্চলে। স্থানীয় অঞ্চলটির অধিবাসী বলতে মালয়ী ও পাপুয়া-রাই প্রধান। কাছেই একটা গ্রাম থেকে অভিযানের সঙ্গী হিসাবে দু'টি লোককে বেছে নিলেন টেরি মাইকেল।

অ্যামেসি এবং বাজোড়া। বৃষস্কন্ধ, খর্বাকৃতি অ্যামেসি স্থানীয় ওলন্দাজ ভাষা বেশ ভালই আয়ত্ত করেছিল। সুতরাং যা কিছু কথাবার্তা, তা হত মাইকেল এবং অ্যামেসির মধ্যেই। অপেক্ষাকৃত দুর্বল চেহারার অধিকারী বাজোড়া নামক যে স্থানীয় অধিবাসীটি মালবাহকের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল সে ঐ ওলন্দাজ ভাষা একেবারেই বলতে পারত না।

অভিযান সম্পর্কে খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাইকেল বুঝলেন যে কোমোডোর ড্রাগন অ্যামেসি বা বাজোড়া কারো কাছেই অশ্রুতপূর্ব নয়—জনশ্রুতি সম্পর্কে তারা বেশ ভাল ওয়াকিবহাল।

অ্যামেসি তবু সাহেবের হাতের ঐ 'অস্ত্রটার' ভরসায় সঙ্গে থাকতে রাজী হল, কিন্তু বাজোড়া সঙ্গে গেলেও দ্বীপে নামতে নারাজ। অগত্যা বাজোড়াকে নৌকায় রেখে তারা দু'জন দ্বীপে নামবেন বলে ঠিক হল।

দু'টি ভূখণ্ডের অন্তর্বর্তী সংকীর্ণ খাড়ি অতিক্রম করে নৌকাটা অপর একটি দ্বীপের পাড়ে এসে ঠেকলো।

কোমোডো দ্বীপ!

জলের পাড থেকে ঘন ঘাসের জঙ্গল বিস্তৃত হয়েছে দ্বীপের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি পাহাড় বা টিলার সানুদেশ পর্য্যন্ত। টিলার নীচে ছোট ছোট গাছ এবং ঝোপ ঝাড় দূর থেকেই অভিযাত্রীদের চোখে পড়ল। ভূ-প্রকৃতির চরিত্র অনুধাবন করে অভিযাত্রীরা বুঝলেন যে অত্যন্ত সতর্ক হয়েই তাদের দ্বীপে অবতরণ করতে হবে। যে কোন মুহূর্তে ঘন ঘাসের জঙ্গল ভেদ করে বিপদ তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং নৌকার পাহারায় বাজোডাকে রেখে রাইফেল এবং ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে দুই শিকারী কোমোডো দ্বীপের বুকে পা রাখলেন।

চারপাশের ঘাসজঙ্গল ভেদ করে দৃষ্টি চলে না, উপরন্তু, কোমোডোর ড্রাগনের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ—প্রতি মুহূর্তের সজাগ সতর্কতা নিয়ে মাইকেল অগ্রবর্তী হলেন। সঙ্গীর দিকে দৃষ্টিপাত করে মাইকেল লক্ষ্য করলেন, অ্যামেসির সমস্ত পেশী সংবদ্ধ হয়েছে উন্মুখ প্রতীক্ষায়, শিকারী শার্দুলের মত লঘুপায়ে সে তার সাহেবকে অনুসরণ করছে। তার হাতে ধরা শাণিত বর্শা, কোমরে লতার বন্ধনীতে সংলগ্ন বিশাল ছুরিকা। অভিযানের উপযুক্ত সঙ্গী সন্দেহ নেই। মাইকেল বেশ খানিকটা ভরসা পেলেন।

সতর্ক পায়ে প্রায় গোটা ঘাস-জমিটা অতিক্রম করে এসেছেন দুই শিকারী, এমন সময় ঘটল প্রথম অঘটন—

শিকারীদের সম্মুখবর্তী পাহাড়ী সমতলভূমির উপর আচম্বিতে জেগে উঠল কয়েকটি হিংস্র কণ্ঠের গর্জনধ্বনি এবং একাধিক বস্তুর ঝোপঝাড় আলোড়িত করে ছুটে যাওয়ার শব্দ। উভয় শিকারীই বুঝলেন যে তাঁদের দু'পাশের ঘাস জঙ্গল ভেদ করে ছুটে চলেছে একদল জান্তব অস্তিত্ব, যদিও তাদের স্বরূপ শিকারীদের কাছে অজ্ঞাত।

হঠাৎ মাত্র দশ ফুট দূরের একটা ঝোপ সন্দেহজনকভাবে নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠল মাইকেলের শিকারীর স্নায়ু, হাতের আঙুল রাইফেলের ট্রিগার স্পর্শ করল।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত···

ঝোপের মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করল শাণিত কিরীচের মত দু'টি দাঁত এবং রক্তবর্ণ দু'টি চোখ।

'বুনো শুয়োর!'

হাতের বর্শা আনত করে অ্যামেসি প্রস্তুত হল, খর্বাকৃতি দেহটা টানটান হয়ে ঝুঁকে এল সামনের দিকে।

হিংস্র গর্জন করে ছুটে এল বন্যবরাহ। শাণিত কিরীচে খেলে গেল চকিত বিদ্যুতশিখা। সঙ্গে সঙ্গে মাইকেলের হস্তধৃত রাইফেলের মুখে জাগল গর্জিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং ধরাপৃষ্ঠে লম্বমান হল কোমোডোর বুনোশুয়োর। বরাহ ধরাশয্যা গ্রহণ করা মাত্র কোমরের খাপ থেকে ছোরা টেনে নিয়ে অ্যামেসি ছুটে গেল এবং মৃতদেহের পরিচর্যায় নিযুক্ত হল। সামান্য সময়ের মধ্যে বরাহের মৃতদেহ থেকে ছালছাড়ানো বড একখণ্ড মাংস কেটে নিয়ে হাতে তুলে ধরল অ্যামেসি—'আজ রাতের খাবার।' তারপর পরিত্যক্ত দেহটার দিকে পুনরায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বলে উঠল—'সাহেব! কোমোডোর ড্রাগনও বোধ হয় বুনো শুয়োরের মাংস পছন্দ করে—'

মন্দ প্রস্তাব নয়।

মাইকেলের মনে ধরল কথাটা।

শুয়োরের মাংসের টোপে মাংসাশী সরীসৃপদের প্রলুব্ধ করা কঠিন হবে না। ফলে দু'জনে মিলে গুরুভার মৃতদেহটাকে টেনে তুলে আনলেন টিলার উপরে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জায়গায়। গাছ এবং প্রস্তরখণ্ডের সন্নিবেশে টিলার উপরে এক জায়গায় তৈরী হয়েছে প্রাকৃতিক অন্তরাল, বুনো শুয়োরের দেহাংশ সেই আড়ালের সম্মুখবর্তী জমির উপর রেখে দিলেন শিকারীরা। উদ্দেশ্য, বরাহমাংসের টোপে প্রলুব্ধ হয়ে কোমোডোর অতিকায় সরীসৃপরা যদি এসে হাজির হয়, তাহলে ঐ গাছ এবং পাথরের আড়াল থেকে মাইকেল তাঁর ক্যামেরার 'চোখ' দিয়ে ঐ অদ্ভুত প্রাণীদের কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য মুহূর্ত ধরে রাখবার চেষ্টা করবেন।

টোপ সাজিয়ে রেখে শিকারীরা পরিবৃত অরণ্য-অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করতে বেরোলেন। একটু এগিয়েই গাছের সারির নীচে বালুকাময় জমির উপর মাইকেলের নজরে পড়ল সুদীর্ঘ নখরযুক্ত প্রকাণ্ড থাবার ছাপ এবং কোনো গুরুভার দেহকে বহন করে নিয়ে যাবার টানা দাগ। শিকারে অভিজ্ঞ মাইকেল বুঝলেন ভীতিপ্রদ ঐ অজানা পায়ের ছাপের মালিক আর কেউ নয়, কেমোডোর অতিকায় ড্রাগন!

পায়ের ছাপ অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন না শিকারীরা, এগিয়ে গেলেন সম্মুখবর্তী অরণ্যের মধ্যে। পথের মধ্যে একজায়গায় ভেঙে

পড়েছে কয়েকটি গাছ, ফলে ঐ পথটুকু একরকম হামাগুড়ি দিয়েই পার হলেন তাঁরা। কিন্তু তাদের সামনে অদূরে ফাঁকা জমির উপর অপেক্ষা করছিল এক নতুন বিস্ময়—

এক বিরাট মহীরুহকে আশ্রয় করে, শূন্যে ঝুলছে একটি শক্ত মোটা লতা, আর সেই লতা-সংলগ্ন যে প্রকাণ্ড সজীব দেহটা ধীরে ধীরে পাক খুলে মাটির উপর নেমে আসছে সেটা লক্ষ্য করে বিস্ফারিত-দৃষ্টি মাইকেল এবং অ্যামেসির মুখ দিয়ে কোন শব্দ নির্গত হল না। যদিও বস্তুটির স্বরূপ চিনতে দু'জনের কারুরই ভুল হয় নি। জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাসকারী সরীসৃপ বংশের অন্যতম কুলীন—'বোয়া কনস্ট্রিকটার' বা অতিকায় অজগর!

বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে দেরী হল না মাইকেলের, পর পর কয়েকবার তাঁর হাতের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জন করে উঠল নির্ভুল লক্ষ্যে। গাছের উপর থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ল দানব-সরীসৃপের প্রাণহীন বিশাল দেহ। সাপ মরল বটে, কিন্তু রাইফেলে পুনরায় গুলি ভরতে গিয়ে মাইকেল আবিষ্কার করলেন যে তাঁর সংগ্রহে আর একটিও গুলি নেই। সম্ভবতঃ হামাগুড়ি দিয়ে আসার সময়ই সামনের বুকপকেট থেকে গুলিগুলো নিঃশব্দে ঘাসে আবৃত মাটিতে পড়ে গিয়েছে। এখন আবার হামাগুড়ি দিয়ে গুলি খুঁজতে যাওয়া অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও কঠিন ব্যাপার, বরং নৌকায় ফিরে গিয়ে প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করে আনা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বলে বিবেচিত হল শিকারীদের কাছে।

কিন্তু নৌকায় ফেরবার পথে পূর্বে উল্লিখিত 'রাতের খাবার'-টি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হবে। উভয়েই ফিরলেন টিলার উপরিভাগে গাছ আর পাথরে ঢাকা আড়ালটির দিকে।

মাইকেলের হাতের রাইফেল অকেজো হয়ে পড়েছিল। যেখানে বুনো শুয়োরের দেহাবশিষ্ট রেখে শিকারীরা চলে গিয়েছিলেন, নির্দিষ্ট সেই স্থানটি থেকে প্রায় একশ গজ দূরে এসে অ্যামেসি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর তার কোমরের লতাবন্ধনী থেকে ভারী ছোরাটা খুলে নিয়ে এগিয়ে দিল মাইকেলের দিকে। মাইকেল অস্ত্রটা সংগ্রহ করলেন, কিন্তু সঙ্গীর মুখে আতঙ্কের ছাপও তাঁর দৃষ্টি এড়াল না। মাইকেল বুঝতে পারলেন যে, আগ্নেয়াস্ত্র অকেজো হয়ে যাওয়ার ফলে অ্যামেসি ভয় পেয়েছে! তার সাহস ফিরিয়ে আনার জন্য মুখে দু-চারটে কথা বললেও অভিজ্ঞ শিকারীর পক্ষে সঙ্গীর প্রকৃত

মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে অসুবিধা হল না। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে দ্রুতগতিতে তিনি এগিয়ে চললেন।

গাছ আর পাথরে ঘেরা জায়গাটির খুব কাছাকাছি এসে পড়েছেন দুই শিকারী—আর মাত্র গজ পঁচিশেকের ব্যবধান। হঠাৎ, এক ঝটকায় অ্যামেসিকে টেনে নিয়ে মাইকেল আত্মগোপন করলেন সামনের একটা ছোট ঝোপের আড়ালে। তাদের সম্মুখে উন্মুক্ত দৃষ্টিপথে ভেসে উঠেছে এক ভয়াবহ দৃশ্য—

মরা শুয়োরের দেহটার খোঁজে এসে উপস্থিত হয়েছে দু'টো অদ্ভুত-দর্শন প্রাণী। লম্বায় তাদের প্রত্যেকটিই প্রায় বারো ফুটের উপর। দানব গিরগিটির মত শরীরটা আগাগোড়া রুক্ষ, অজস্র গুটিওয়ালা খসখসে চামড়ায় ঢাকা। লম্বা কুৎসিৎ গ্রীবার উপর বসানো কদাকার মস্তক এবং চিতাবাঘের মত নখরভয়াল চারটে পায়ের থাবা। সব মিলিয়ে মাইকেলের মনে হল তাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছে দু'টো দুঃস্বপ্নের জীব!

পিছনের দু'টো পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল একটা সরীসৃপ। তারপর এগিয়ে গেল অদূরবর্তী মৃত দেহটার দিকে। দন্তভয়াল মুখগহ্বরের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল সাপের জিভের মত অস্বাভাবিক লম্বা একটা বিভক্ত জিভ। পরমুহূর্তে ড্রাগনের দু'টো শক্তিশালী চোয়ালের ফাঁকে বজ্রদংশনে আবদ্ধ হল শুয়োরের স্থূলদেহ। কুকুর যেভাবে একটা ছোট খেলনা মুখে তুলে ঝাঁকানি দেয়, ঠিক সেইভাবে ড্রাগনটা অবলীলায় দেহটাকে কামড়ে ধরে এক ঝটকায় শূন্যে তুলে ফেললো। দু-চারটে ঝাঁকানি দিতে শুয়োরের শক্ত চামড়া ভেদ করে মাংসের মধ্যে প্রবেশ করল সরীসৃপের ধারালো দাঁতের সারি। বড় একখণ্ড মাংস গলাধঃকরণ করে শবটাকে আবার মাটিতে নামিয়ে রাখল সেই অতিকায় সরীসৃপ।

ভয়াবহ দৃশ্য!

কোমোডোর ড্রাগন সম্পর্কে অ্যামেসির যাবতীয় অভিজ্ঞতা, এতদিন পর্য্যন্ত জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু উপকথার জীব যে কোনদিন বাস্তবে তার সামনে সশরীরে আবির্ভূত হতে পারে, এ কথা সে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবে নি। ফলে এই প্রত্যক্ষদর্শনের প্রভাবে তার স্নায়ুযন্ত্র দুর্বল এবং অসাড় হয়ে পড়ল। ছোট ছোট ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে মাইকেলের পিছনে পিছনে সে দিশাহারা শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললো পাথরের আড়ালটার দিকে।

তবু শেষরক্ষা হল না!

আগেই বলেছি যে রাতের খাবারের জন্য শূয়োরের দেহ থেকে কেটে নেওয়া মাংসের খণ্ডটি আলাদাভাবে কয়েকটা পাথরের চাঁই-এর আড়ালে রেখে গিয়েছিলেন শিকারীরা, এবং ঐ উপাদেয় খাদ্যবস্তুটি সংগ্রহ করতেই তাঁরা ফিরে এসেছিলেন।

মাইকেল ঝোপের আড়ালে আড়ালে এসে পড়েছেন পাথরের প্রাচীরটার কাছে। আর মাত্র কয়েকগজ অতিক্রম করলেই তাঁরা নিরাপদ। এমনকি ঐ পাথরগুলোর আড়াল থেকে সুযোগমত ড্রাগন দু'টোর ছবিও তোলা যেতে পারে। কিন্তু আতঙ্কে বিহ্বল অ্যামেসির পক্ষে আর ধৈর্য্য ধরা সম্ভব হল না। জন্তু দু'টোর সান্নিধ্য থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য হঠাৎ সে জমি ছেড়ে সটান দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর পাগলের মত এক প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সম্মুখবর্তী পাথরটার অপর দিকে।

বেশ খানিকটা চমকে গিয়েছিলেন মাইকেল।

কিন্তু পরমুহূর্তে তার বিহ্বলতাকে ছাপিয়ে প্রস্তরপ্রাচীরের অপরদিক থেকে ভেসে এল অ্যামেসির ভয়ার্ত আর্তনাদ এবং তার সঙ্গে রক্তজমানো এক বিজাতীয় হিস্ হিস্ শব্দ। প্রকৃত ঘটনা বুঝতে মাইকেলের দেরী হল না, হামাগুড়ি দেওয়ায় ইস্তফা দিয়ে তিনি একলাফে পাথরটার উপর উঠে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে, পৃথিবীর দৃশ্যপট যেন পিছিয়ে গেলো দু'কোটি বছর আগে এক প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগে···

শূয়োরটার দেহ থেকে সংগৃহীত মাংসখণ্ডটার গন্ধে গন্ধে প্রস্তরবেষ্টিত স্থানটির মধ্যে এসে হাজির হয়েছে তৃতীয় একটা ড্রাগন। আর ভয়ার্ত অ্যামেসি লাফ দিয়ে ঐ ভোজনরত সরীসৃপের একেবারে সামনে এসে পড়েছে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে—

মাইকেলের মনে হল আদিম পৃথিবীর এক আক্রান্ত গুহামানব প্রাণপনে লড়াই করছে প্রাগৈতিহাসিক এক দানবের সঙ্গে···

হাতের রাইফেল অকেজো হয়ে পড়েছে। তবু সেটাকেই মুগুরের মত বাগিয়ে ধরে ড্রাগনের কুৎসিৎ মস্তকের উপর প্রাণপণে আঘাত হানলেন টেরি মাইকেল। আঘাতের তীব্রতায় সরিসৃপটা মুখব্যাদন করল, দুই চোয়ালের মাঝখানে উঁকি দিল সারিবদ্ধ দাঁতের কিরীচ। পিছনের পায়ের একটা প্রকাণ্ড থাবা দিয়ে অ্যামেসির ভূতলশায়ী দেহটাকে চেপে ধরে জন্তুটা তার নতুন প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করল···

সতর্ক থাকলেও নিষ্কৃতি পেলেন না মাইকেল। বাঘের থাবার মত ভয়ংকর একটা থাবা তাঁর বাঁ কাঁধের উপর এঁকে দিয়ে গেল সুদীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন এবং পর-মুহূর্তে তাঁর সমস্ত সতর্কতার বেড়া ডিঙিয়ে চাবুকের মত একটা প্রকাণ্ড লেজ অতর্কিত আঘাতে তাঁকে ছিটকে ফেলে দিল অদূরবর্তী একটা পাথরের উপর।

অর্ধলুপ্ত চেতনার মধ্যেও টেরি মাইকেল উপলব্ধি করলেন যে, পাথরে ঘেরা ছোট্ট জায়গাটুকুর মধ্যে কোনঠাসা অবস্থায় ড্রাগনের সম্মুখীন হওয়া শুধু নির্বুদ্ধিতাই নয়, এক সাংঘাতিক ঝুঁকিও বটে—

বন্দুক হাত থেকে ছিটকে গিয়েছিল। অস্ত্র বলতে এখন অ্যামেসির দেওয়া ছোরাটাই একমাত্র ভরসা। কটিবন্ধ থেকে ভারী ছোরাটা খুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন মাইকেল। কিন্তু অন্যদিক থেকে আক্রমণ এল না, টলতে টলতে পাথরের উপর উঠে পড়েছে দানব সরীসৃপ। মাইকেল বুঝলেন যে, বন্দুকের কুঁদোর আঘাত বেশ জোরালোই হয়েছিল। স্থানত্যাগ করতে উদ্যত ড্রাগনকে বিরক্ত করার কোন সদিচ্ছা মাইকেলের ছিল না, কিন্তু অ্যামেসির দিকে চোখ পড়তে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন—

অর্ধলুপ্ত চৈতন্যের ঘোর কাটিয়ে অ্যামেসি তখন উঠে বসেছে। উদ্‌ভ্রান্তের মত সে একবার দৃষ্টি সঞ্চালিত করল অদূরে প্রস্থানোদ্যত সরীসৃপটার দিকে। তারপর হঠাৎ উন্মাদের মত ছুটে গিয়ে হাতের বর্শাটাকে আমূল বিদ্ধ করে দিল কদাকার জন্তুটার পাঁজরের নীচে।

ড্রাগনের কণ্ঠ থেকে নির্গত হল তীব্র হিস্‌ হিস্‌ শব্দ, বিস্তৃত মুখগহ্বরের মধ্যে থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল একগাছা দড়ির মত দীর্ঘ একটা চেরা জিভ, এবং প্রকাণ্ড একটা লেজের আঘাতে অ্যামেসি ছিটকে পড়ল মাটির উপরে। তার চৈতন্যকে লুপ্ত করে নেমে এল মূর্চ্ছার ঘন অন্ধকার।

ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত শূন্যে বাতাস কেটে আহত সরীসৃপের বিশাল দেহটা ঘুরপাক খেয়ে ছিটকে এসে পড়ল মাইকেলের সামনে।

ততক্ষণে ভয় উবে গেছে মাইকেলের মন থেকে।

হাতের ছোরাটাকে শক্ত করে ধরে তিনি ক্রমাগত কোপ মারতে লাগলেন জন্তুটার ঘাড়ে, পেটে এবং শরীরের অন্যান্য দুর্বল স্থানে। তীব্র আতঙ্কে তখন তার বাহ্যিক অনুভূতি প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল। টেরি মাইকেলের কাছে তখন একটি কথাই সত্য—'হয় মারো, নয় মরো।' চরম আঘাত হানবার জন্য

ছোরাটাকে শক্ত মুঠোয় তুলে ধরলেন মাইকেল। তারপর দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে নামিয়ে আনলেন ড্রাগনের মাথা লক্ষ্য করে।

শূন্যে বিদ্যুৎ চমকে নির্ভুল লক্ষ্যে নেমে এল শিকারীর হাতের অস্ত্র। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা জীবন্ত চাবুক সশব্দে আছড়ে পড়ল মাইকেলের দেহের উপর···

প্রচণ্ড আঘাতের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে প্রস্তরশয্যা ত্যাগ করে উঠে পডলেন মাইকেল। তারপর অ্যামেসির অর্ধ অচেতন দেহটাকে টানতে টানতে সরিয়ে আনলেন নিরাপদ স্থানে। অদূরে মরণাহত সরীসৃপের গোটা দেহ পাক খেয়ে খেয়ে আস্ফালিত হয়ে উঠছে, তার একটি আঘাতে অ্যামেসির মৃত্যু ঘটাও অস্বাভাবিক নয়।

নৌকা থেকে ক্ষতগুলোর প্রাথমিক চিকিৎসা সেরে গুলিভরা রাইফেল হাতে টেরি মাইকেল আবার দ্বীপে পদার্পণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য কোমোডো ড্রাগনের অপূর্ব গাত্রচর্মটি সংগ্রহ করা। তখনকার মত সংগৃহীত হলেও শেষ পর্যন্ত অবশ্য মাইকেলের ভাগ্যে চামড়াটা জোটেনি। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভ্যান এফেন মারা যাবার পর সেটা আর মাইকেলের সঙ্গে নিয়ে আসা হয়ে ওঠেনি।

তা নাই বা হল, কিন্তু অভিজ্ঞতার যে স্মৃতিটুকু তাঁর মনে গেঁথে রয়েছে তার প্রভাবেই মাঝে মাঝে মাইকেলের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যায় একটা হিমশীতল স্রোত। ঠাণ্ডা আতঙ্কের শিহরণ!
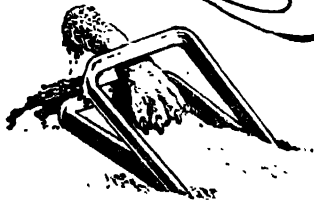
"রেড কিলার" নামে অভিহিত খুনীটার হত্যার সংখ্যা সামান্য কয়েক মাসের মধ্যেই একক, দশকের সীমারেখা ছাড়িয়ে যখন দু'শ-র আওতায় গিয়ে পৌঁছলো, তখন তার মাথার দাম উঠলো ত্রিশ পাউণ্ড।

—"রেড কিলার!"

—"লাল আতঙ্ক!"

মাত্র দুটি শব্দ।

কিন্তু পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার বিস্তীর্ণ তৃণভূমি জুড়ে একদিন ঐ দুটি শব্দ যে ভয়াবহ আতঙ্ক এবং ত্রাসের সঞ্চার করেছিল, বাস্তব সত্য হলেও সে কাহিনী আমাদের কাছে আপাতভাবে অবিশ্বাস্য বোধ হওয়া স্বাভাবিক।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ।

ভূগোল ও জীবতত্ত্বের বিচারে নিতান্তই নিরীহ গোছের ভূখণ্ড। পৃথিবীর এই মহাদেশটির বুকে অবাধে বিচরণ করে না ভয়ংকর মাংসাশী অতিকায় মার্জারকুল অথবা হিংস্র তৃণভোজীর দল। বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ায় না 'কেপ-বাফেলো', গণ্ডার অথবা গুণ্ডা হাতীর পাল—নিরীহ জেব্রার পিছনে গুঁড়ি মেরে ঝোপে ঝাড়ে জ্বলে ওঠে না পশুরাজ সিংহ অথবা লেপার্ডের হিংস্র সবুজ চোখ। এমন কি 'আলাস্কান ব্রাউনি' অথবা "গ্রিজলী-বীয়ার"-দের মত অতিকায় ঋক্ষরাজরাও এখানে অনুপস্থিত।

ফলে পাঠকপাঠিকার মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে—কে এই খুনী! জীব-তত্ত্বের কোন্ গোষ্ঠিতে মিলবে এর পরিচয়?

প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা ফিরে যাব আমাদের কাহিনীর স্থান, কাল ও পরিবেশে—

পূবের আকাশে তখন সূর্যোদয়ের রক্তিম আভা। পাণ্ডুর কুয়াশাচ্ছন্ন দিগন্তে ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে রাতজাগা তারার দল!

নিস্তব্ধ, সুন্দর ওয়ারুণা উপত্যকার বুক চিরে জেগে উঠলো মেষশাবকের

করুণ আর্তনাদ। অতঃপর সকালের স্নিগ্ধ পরিবেশকে কলঙ্কিত করে একাধিক মেষকণ্ঠে শুরু হল এক ভয়ার্ত চীৎকারের ঐকতান। প্রচণ্ড আতঙ্কে তারা আশ্রয় নিয়েছে খোঁয়াড়ের এক কোনে।

কিন্তু কেন এই আতঙ্ক !!!

উপত্যকার বুকে চোখ ফেরালে বোঝা যায় তার কারণ। এখানে ওখানে ইতঃস্তত ছড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি ভেড়া। জীবিত নয়, মৃত। সংখ্যায় প্রায় তেইশটা। প্রত্যেকটা মৃত ভেড়ার গলার কাছে রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। মাত্র চারটির মূত্রাশয় বা "কিডনি", হত্যাকারী অথবা হত্যাকারীরা খেয়ে ফেলেছে। বাকী ভেড়াগুলোর মৃতদেহ প্রায় অক্ষত। বোঝা যায়, নিছক হত্যার আনন্দ চরিতার্থ করার খেয়ালেই খুনী এতগুলো নিরীহ পশুকে হত্যা করেছে।

উপত্যকার রক্ষক তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বুঝলেন যে জন্তুগুলোর হত্যাকারী একটি বা দুটি বিশালাকৃতি 'ডিংগো'। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল লৌহবেষ্টনীর মধ্যবর্তী যে ছিদ্রপথ দিয়ে 'ডিংগো' তৃণভূমির মধ্যে প্রবেশ করেছে সেই ছিদ্রটি একটি ষাঁড়ের কীর্তি। হতভাগা ষাঁড়টাকে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হল এবং ছিদ্রটিও মেরামত করা হল।

কিন্তু এই ঘটনার মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যেই জনৈক অশ্বারোহী মেষরক্ষক লৌহজালিকার গায়ে অপর একটি নতুন ছিদ্র আবিষ্কার করে, এবং এবার বোঝা যায় যে সেটি কোন অসাধারণ শক্তিশালী ডিংগোর কীর্তি। কারণ, সাধারণ কোন ডিংগোর পক্ষে ঐ লোহার জাল দাঁত দিয়ে কেটে ফেলা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞ মেষ পালক বুঝলেন যে, একই 'ডিংগো' অনুরূপ পন্থায় বারবার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে ওয়ারুণা তৃণক্ষেত্রের ভেড়াগুলোর উপর। কারণ, কোন 'ডিংগো' একবার যেখানে শিকারের জন্য হানা দেয়, দেড়মাসের মধ্যে সেই জায়গায় সে পুনর্বার ফিরে আসবেই, এবং এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। ফলে বেষ্টনীর মধ্যবর্তী ছিদ্র মেরামত না করে, আগত রাত্রে খুনী অথবা খুনীদের অভ্যর্থনার জন্য বেড়ার সামনে পাতা হল ইস্পাতের ফাঁদ এবং মৃত ভেড়াগুলোর 'কিডনি'-তে প্রবেশ করিয়ে রাখা হল প্রচুর পরিমাণে 'স্ট্রিকনিন' বিষ। ওয়ারুণার মালিক সমস্ত আয়োজন শেষ করে নিশ্চিন্ত হলেন বটে, কিন্তু তখনও তিনি জানতেন না যে, তাঁর সুদীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায়, সাধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মগুলিই শুধু তিনি জেনেছেন। সে নিয়ম ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না।

পরদিন প্রত্যুষে আশাভরা মন নিয়ে ছুটে এলেন পশুপালক। কিন্তু বেড়ার পাশে পাতা ইস্পাতনির্মিত ফাঁদের কাছে আসতেই চমকে উঠলেন তিনি। অবিশ্বাস্য !!!

ফাঁদে আটকে আছে লালচে-বাদামী রংয়ের কনুই পর্যন্ত কাটা একটা বাঁ-পা। সন্দেহ নেই কর্তিত পা-টির মালিক একটা ডিংগো, কিন্তু ফাঁদে আটকা পড়ে যে জন্তু, নিজের পা ছাড়াতে না পেরে, নিজে চিবিয়ে কেটে ফেলে চম্পট দেয়, সে কি ধরনের ভয়ংকর এবং নৃশংস প্রাণী !

লালচে-বাদামী রঙের 'কাটা পা'-এর জন্যই উপত্যকায় ডিংগোটা পরিচিতি লাভ করলো 'রেড কিলার' নামে—আক্ষরিক অর্থে যার মানে দাঁড়ায় "লাল খুনী"। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে 'রেড কিলার' ওয়ারুণার বুকে তার নৃশংসতার প্রথম স্বাক্ষর রাখল।

যারা এই কাহিনী পড়ছেন, আমি এইখানে তাঁদের কৌতূহল নিরসনের প্রয়োজনে "ডিংগো" নামক প্রাণীটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানিয়ে রাখছি।

শ্বাপদবিরল অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে 'ডিংগো' নামক একধরনের বুনো কুকুরই একমাত্র বড়সড় শ্ব-দন্তী, মাংসাশী প্রাণী। এই হিংস্র সারমেয় বাহিনীর কবলে প্রতিবছরই প্রাণ হারায় বেশ কিছু সংখ্যক নিরীহ গৃহপালিত পশু। প্রধানতঃ পশুপালনের উপর নির্ভর করেই যে সব পশুরক্ষক জীবন নির্বাহ করে তারাও এই স্বাভাবিক ক্ষতিটা স্বীকার করে নিয়েছিল। উপরন্তু, মাঝে-মধ্যে তাদের পাতা ফাঁদে হামলাকারী দু-চারটে ডিংগো প্রায়শঃই ধরা পড়তো। তাই যদিও এই ছিঁচকে খুনীগুলোকে নিয়ে তাদের ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত, তবু এই বুনো কুকুরগুলো কখনোই উপত্যকায় ব্যাপক আতঙ্কের কারণ হয় নি। কিন্তু এই গতানুগতিক ধারাকে একটু পাল্টাতে ওয়ারুণার উপত্যকার বুকে আবির্ভূত হল ত্রাস সঞ্চারকারী বর্ণসঙ্কর একটা বিশালাকৃতি বুনো কুকুর—আমাদের কাহিনীর নায়ক "রেড-কিলার"। কুকুর প্রজাতিতে, আমাদের আলোচ্য ডিংগোটা স্বভাবচরিত্রের দিক দিয়ে ছিল এক বিরাট ব্যতিক্রম। কাহিনীর পরবর্তী পর্যায়ে তার আরও পরিচয় মিলবে।

দৈনন্দিন নিয়ম অনুসারে জনৈক ব্যক্তি একদিন সকালে দুধের বালতি হাতে নিয়ে গোয়ালে গিয়েছিল। কিন্তু গোয়ালের দরজা খুলতেই যে ভয়াবহ দৃশ্য তার দৃষ্টিগোচর হল তার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। গোয়ালের মধ্যে গরুটা রক্তাক্ত দেহে কোনরকমে শ্বাস টানছিল আর তার পাশেই মাটিতে পড়ে ছিল

মৃত গো-শাবকটির দেহ। প্রায়-অক্ষত বাছুরটার মৃতদেহের মধ্য থেকে কেবলমাত্র হৃৎপিণ্ডটি হত্যাকারী উপড়ে তুলে নিয়ে ভক্ষণ করেছে। শাবকটিকে হত্যাকারীর কবল থেকে বাঁচাবার চেষ্টায় গরুটিও অক্ষত নেই। প্রচণ্ড দংশনে তার পিছনের পায়ের শিরা এবং আঙুলের অর্ধাংশ হয়েছে ছিন্ন। বদ্ধ গোয়ালের বেড়ার গায়ে একটি ছিদ্র পথ দিয়ে হত্যাকারীর আবির্ভাব ঘটেছে। গোয়ালঘরের জমি পর্যবেক্ষণ করে জানা গেল যে হত্যাকারী মাত্র তিনটি পায়ের অধিকারী, অর্থাৎ আবার পুনরাবির্ভূত হয়েছে "রেড কিলার"।

এই সময়ে অস্ট্রেলীয় সরকারও 'ডিংগো' সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ ঐ হতচ্ছাড়া কুকুরগুলোর জন্য প্রতি বছরই সরকারকে বেশ কিছু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছিল। খুনী কুকুরগুলোর মাথাপিছু তাই সরকারের তরফ থেকে তিন পাউণ্ড করে পুরস্কার ঘোষণা করা হল। সেই সঙ্গে ওয়ারুণার মালিক এবং প্রতিবেশী অপর দুই পশুপালকের ঘোষিত পুরস্কারের অঙ্ক মিলিয়ে 'রেড কিলার'-এর মাথার দাম গিয়ে উঠলো পনেরো পাউণ্ডে।

অর্থের পরিমাণ খুব সামান্য নয়। ফলে দলে দলে পেশাদার ও অপেশাদার শিকারীরা এসে ভিড় জমাতে লাগল ওয়ারুণা উপত্যকায়, কিন্তু "বিষাক্ত মাংসের টোপ" অথবা বিশেষ ভাবে পাতা ফাঁদ কোন কিছুতেই প্রলুব্ধ হয়ে বা ভুলক্রমে ধরা পড়ল না ঐ তে-ঠেঙা শয়তানটা, বরং শিকারীদের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে লাগল তার হত্যালীলা। শিকারীদের কৌশল এবং জন্তুটার সতর্কতার এই প্রতিযোগিতা এই ভাবে চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত কি হত বলা যায় না, কিন্তু এরই মাঝে সমস্ত উত্তেজনার অবসান ঘটিয়ে জন্তুটা হঠাৎ ওয়ারুণার বুক থেকে উধাও হল। বেশ কিছুদিন তার আর কোন হদিশ মিললো না। মেষপালকের দলও আস্তে আস্তে "রেড কিলার"-এর অস্তিত্বের কথা ভুলে যেতে শুরু করেছিল, কিন্তু শয়তান "ডিংগো"-টা যে তার নিগ্রহের কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলে যায়নি, সেকথা বুঝতে তাদের তখনও কিছু দেরী ছিল।

"লাল খুনী"-টার পুনরাবির্ভাবের ঘটনাটি যেমন ভয়ংকর, তেমনই চমকপ্রদ। এই ঘটনাটিই প্রমাণ করে যে কুকুরটা সেই সময় হয়ে উঠেছিল সাংঘাতিক বেপরোয়া এবং অবশ্যই বিপজ্জনক।

উক্ত ঘটনার দিন জনৈক ব্যক্তি একটি ঘোড়ায় টানা গাড়ী নিয়ে ওয়ারুণা উপত্যকার একটি প্রান্তে পরিত্যক্ত ঘাসজমির আগাছা পরিষ্কার করছিল। লোকটির সাথী ছিল তার পোষা টেরিয়ার কুকুর। কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে লোকটি

কুকুরটার অদ্ভুত আচরণে মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করছিল। একটা বিশেষ ঝোপের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে টেরিয়ারটা মাঝে মাঝেই চীৎকার করে উঠছিল ভয়ার্ত স্বরে। ফলে, দু-একবার কৌতূহলী হয়ে লোকটি ঝোপের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ঠিকই কিন্তু একটা গিরগিটি ছাড়া সন্দেহজনক আর বিশেষ কিছু তার চোখে পড়ল না। সুতরাং, সে সেদিকে আর বিশেষ লক্ষ্য না রেখে পুনরায় তার কাজে মন দিল। একটু পরে, জমির একদিকের জঞ্জাল সাফ করা হয়ে গেলে, গাড়ীটাকে জমির অন্যপ্রান্তে নিয়ে যাবার জন্য ঘুরতেই তার চোখ পড়ল অদূরবর্তী ঝোপটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পারল তার পোষা কুকুরটার আতঙ্কের কারণ। ঝোপের মধ্যে থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে লালচে-বাদামী রঙের এক অতিকায় সারমেয় দানব। হ্যাঁ কুকুর বটে, কিন্তু কোনক্রমেই সেই কদাকার জীবটাকে চতুষ্পদের সংজ্ঞায় ফেলা যায় না, কারণ লোকটি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল যে জন্তুটার সামনের দিকের বাঁ-পা প্রায় কনুই পর্য্যন্ত কাটা, পক্ষান্তরে এটাকে ত্রি-পদ বলে অভিহিত করা যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। বিগতদিনের অভিজ্ঞতায় লোকটির বুঝতে দেরী হল না যে, এটাই ওয়ারুনার জান্তব বিভীষিকা— সেই কুখ্যাত "রেড কিলার"। জন্তুটার অবয়বে "ডিংগো" এবং অস্ট্রেলিয়ার শিকারী কুকুর "ক্যাঙারু-ডগ"-এর সাদৃশ্য প্রমাণ করছিল যে বিশালাকৃতি কুকুরটা একটা বর্ণসঙ্কর।

লোকটির উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ক্ষিপ্রগতিতে জন্তুটা এগিয়ে গেল টেরিয়ারটার দিকে। নিকটবর্তী হয়ে সে প্রথমে তার ঘ্রাণ গ্রহণ করল বার-কয়েক, তারপরই প্রচণ্ড দংশনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি কুকুরটার কণ্ঠনালী চেপে ধরে এক ঝটকায় শূন্যে তুলে নিল। কয়েকটি করুণ মুহূর্ত। তারপরই হতভাগ্য টেরিয়ারটার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল সম্মুখবর্তী জমির উপর।

পোষা কুকুরটার এই শোচনীয় মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে হতভম্ব মানুষটির সম্বিত ফিরে এল এতক্ষণে। হাতের সামনে অস্ত্র বলতে তার ছিল একটা লোহার "স্প্যানার" অর্থাৎ বল্টু খোলার যন্ত্র। সেটিকে হস্তগত করে সে ছুটে গেল এবং একের পর এক আঘাত হানতে লাগল আক্রমণকারী "ডিংগো"-টার মাথায়। "স্প্যানার"-এর কঠিন আঘাত বুনো কুকুরটাকে বিশেষ কাবু করেছে বলে কিন্তু প্রতীত হল না, কারণ সেই আঘাতকে অগ্রাহ্য করে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ভয়ংকর কুকুরটা টেরিয়ারের মৃতদেহটাকে পরিণত করল কয়েকটি মাংসের ফালিতে।

কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই আক্রমণকারী মানুষটির প্রতি ডিংগোটার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় ঘুরে দাঁড়িয়ে এবার সে আততায়ীর কণ্ঠদেশ লক্ষ্য করে লাফ দিল। কোনোক্রমে নিজের বাঁ হাত দিয়ে কুকুরটার মারাত্মক আক্রমণ প্রতিহত করে, প্রাণপণ শক্তিতে মানুষটি তার ডান হাতে ধরা ভারী স্প্যানারটা ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ করে চললো 'খুনী'-টার মাথায় এবং দেহের উর্ধ্বাংশে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধাতব আলিঙ্গনের যন্ত্রণাময় অনুভূতি থেকে পরিত্রাণ পেতে 'ডিংগো'-টা অদূরবর্তী একটা ঝোপের মধ্যে দিয়ে পালাল দূরবর্তী জঙ্গলের আশ্রয়ে। শুধু তার আবির্ভাবের প্রমাণস্বরূপ পড়ে রইল বাচ্চা কুকুরটার ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ এবং আক্রান্ত ব্যক্তিটির দেহে শ্বাপদের নখ ও দাঁতের সংস্পর্শে সৃষ্ট কয়েকটি কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের এই আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে গোটা ওয়াক্ষণার বুকে তীব্র উত্তেজনার সঞ্চার করে আবার গা-ঢাকা দিল আমাদের কাহিনীর নায়ক "রেড কিলার"।

তবে বেশীদিনের জন্য নয়। মাত্র দিনকয়েকের মধ্যেই সে আবার হানা দিল উপত্যকার বুকে। এবার সে সঙ্গে করে জুটিয়ে এনেছিল তার এক সঙ্গিনীকে —সম্ভবতঃ শিকারে তার এই একাকীত্ব আর ভাল লাগছিল না।

ঘটনার বিবরণ থেকে জানা যায় যে ঐ সময় ভেড়াগুলোর পানীয় জল সরবরাহের জন্য একটি কূপ নির্মাণের কাজ চলছিল। কাজটির তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন মিঃ ডাউনি নামক একজন শ্বেতাঙ্গ। একদিন সকালবেলা মিঃ ডাউনি অশ্বারোহণে যখন তত্ত্বাবধানের কাজে ব্যস্ত ছিলেন; হঠাৎ তার খেয়াল হল যে চারণভূমির উপর যে ভেড়াগুলো বিচরণ করছিল তাদের মধ্যে একধরনের ভয়ার্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মেষপালের মধ্যে এই আকস্মিক চাঞ্চল্যের কারণ অনুসন্ধান করতে তিনি সম্মুখস্থ চারণভূমির উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। প্রথমে বিশেষ কিছুই তার নজরে পড়ল না। কিন্তু দৃষ্টিসীমার পরিধি খানিকটা বিস্তৃত হতেই চোখে পড়ল···

দূরে, বেশ কিছুটা দূরে, তা কম করেও আধমাইলটাক তো হবেই, দুটি সঞ্চরণশীল অবয়ব। ঐ আকৃতি মিঃ ডাউনির পরিচিত। না! ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই—দুটো বিশাল আকৃতির ডিংগো। চারণভূমির সীমানা যেখানে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা তারই ধারে ঘোরাঘুরি করছে দুটো জানোয়ার। ডিংগো দুটোর মতিগতি মোটেই সুবিধার ঠেকল না ডাউনি সাহেবের। ধীরে ধীরে তাদের দৃষ্টির বাইরে এসেই তিনি প্রাণপণে ঘোড়া

ছোটালেন স্থানীয় মেষরক্ষককে খবর দিতে। প্রসঙ্গতঃ এইখানে উল্লেখ্য যে, মিঃ ডাউনি যে পশুপালকটিকে খবর দিতে এসেছিলেন, "তে-ঠেঙা শয়তান"-টা তাঁর চারণক্ষেত্রেই প্রথম হানা দেয়। ডিংগো দুটোর খোঁজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পশুপালক, মিঃ ডাউনিকে সঙ্গে নিয়ে একটা মোটরগাড়ীতে চড়ে চারণ-ভূমির দিকে দ্রুত রওনা হলেন। দু'জনেই সঙ্গে নিলেন একটি করে রাইফেল।

চারণক্ষেত্রে পৌঁছে শ্বেতাঙ্গদ্বয় আবিষ্কার করলেন যে, ডিংগো দুটো ততক্ষণে লৌহজালের বেষ্টনী ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়েছে এবং ইতোমধ্যেই একটা ভেড়াকে হত্যা করেছে।

অব্যর্থ লক্ষ্যে অগ্নিবর্ষণ করল মিঃ ডাউনির রাইফেল। সঙ্গে সঙ্গে তৃণশয্যা গ্রহণ করল তিন-পা ওয়ালা কদাকার জন্তুটা। কিন্তু আহত হলেও তার সে মূর্চ্ছা ছিল সাময়িক। চকিত আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়েই সে তার তিন-পায়ে ভর করে অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটল লৌহবেষ্টনীর দিকে এবং অপেক্ষাকৃত একটি ক্ষুদ্রাকার ছিদ্র পথ দিয়ে আশ্চর্য্য কৌশলে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উধাও হয়ে গেল। আসল শিকার হাতছাড়া হয়ে যেতে শিকারীরা এবার নজর দিলেন দ্বিতীয় কুকুরটার দিকে। তৃণক্ষেত্রের উপর দিয়ে সেটাও দৌড়ে পালাচ্ছিল। তবে লোহার জালের দিকে নয়, তার উল্টোদিকে। পর পর দুটি গুলি ছুঁড়লেন মিঃ ডাউনি। লক্ষ্য ছিল প্রায় নির্ভুল, কিন্তু আশ্চর্য্য তৎপরতার সঙ্গে একেবেঁকে দৌড়ে ডিংগোটা দুটো বুলেটই এড়িয়ে গেল! চলন্ত মোটর থেকে লক্ষ্য নির্ভুল রেখে রাইফেল চালানো এক কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা সন্দেহ নেই, তাই যে মেষরক্ষক ভদ্রলোকটি গাড়ী চালাচ্ছিলেন তিনি এক ভিন্ন উপায় অবলম্বন করলেন। তাঁর খানিকক্ষণের প্রচেষ্টাতেই পরিকল্পনা সফল হল।

বাম্প্! বাম্প্!

গাড়ীর পর পর দুটো চাকাই একসময় ডিংগোটার গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল। মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ডিংগোটা শেষবারের মত চেষ্টা করল তার আততায়ী দু'জনকে আক্রমণ করার! কিন্তু শ্বেতাঙ্গ শিকারীর রাইফেলের লক্ষ্য এবার আর ব্যর্থ হল না। তপ্ত সীসার মৃত্যু দংশন কুকুরটাকে তৃণক্ষেত্রের উপর শুইয়ে দিল।

আগ্নেয়াস্ত্রের মৃত্যু আলিঙ্গন এড়িয়ে চম্পট দিল 'রেড কিলার', সঙ্গদোষে মৃত্যুবরণ করল তার সঙ্গিনী! কিন্তু সেদিনের জন্য তিন-পা ওয়ালা খুনীটার কপালে আরও কিছু দুর্ভোগ জমা ছিল।

আহত অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে জন্তুটা যখন একটা ঝোপের মধ্যে বিশ্রাম নিচ্ছিল, সেই সময়ই সে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হয়।

ঘটনার বিবরণী থেকে জানা যায় যে ঐ সময়ে স্থানীয় এক কৃষক ঘোড়ার গাড়ী চালিয়ে শহর থেকে গ্রামের দিকে ফিরছিল। গাড়ীর পাশে পাশে ছুটছিল কৃষকের পোষা 'ক্যাঙারু হাউণ্ড'—বিশালাকৃতি শিকারী কুকুর। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঝোপের আড়ালে বিশ্রামরত 'রেড কিলার' কৃষকের দৃষ্টিকে এড়াতে পারল না, এবং বুনো কুকুরটাকে দেখামাত্রই কৃষক তার পোষা শিকারী কুকুরকে লেলিয়ে দিল জন্তুটার দিকে। প্রভুর প্ররোচনায় হাউণ্ডটাও ঝাঁপিয়ে পড়ল আহত, পরিশ্রান্ত, তিনটি পা-ওয়ালা 'ডিংগো'-টার উপর।

কিছুক্ষণ ধরে দুই সারমেয় দানবে লড়াই চললো, কিন্তু অবশেষে বন্য হিংস্রতা এবং রণকৌশলের কাছে পরাজিত হল, শিক্ষিত শিকারী কুকুর। কণ্ঠদেশে গভীর ক্ষতচিহ্ন বহন করে রণে ভঙ্গ দিয়ে পিছিয়ে এল কৃষকের "ক্যাঙারু-হাউণ্ড"। "রেড কিলার" ততক্ষণে এগিয়ে চলেছে অদূরবর্তী জঙ্গলের দিকে। এই ধরনের বিরক্তিকর পরিস্থিতিকে বর্তমানে সে এড়িয়ে যেতে চায়।

কিন্তু কৃষক তাকে অত সহজে মুক্তি দিল না। গাড়ীতে জোতা ঘোড়া খুলে নিয়ে সে জন্তুটার পশ্চাদ্ধাবন করলো। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। অনায়াসে অশ্বারোহী কৃষককে ফাঁকি দিয়ে জঙ্গলের গভীরতর অঞ্চলে আত্মগোপন করল 'রেড-কিলার'।

পরবর্তী ক'টি মাস কাটল নির্বিঘ্নে। আঞ্চলিক অধিকাংশ মেষরক্ষকই বুঝতে পারলো যে আহত অবস্থায় আত্মগোপন কালে মারা গেছে শয়তানটা। ফলে সবাই মোটামুটি কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করল। কিন্তু বৃথা আশা।

পূর্ব প্রথামত "রেড কিলারের" অজ্ঞাতবাসের সমাপ্তি ঘটল পর পর কয়েকটি দিনের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক ভেড়াকে হত্যা করে। ওয়ারুণা উপত্যকার পশুপালকদের রাতের ঘুম আবার উধাও হল।

নতুন করে জন্তুটার মাথার উপর ঘোষিত হল পুরস্কারের মোটা অঙ্ক, নতুন করে উদ্ভাবিত হতে লাগলো কৌশলের পর কৌশল, নতুন করে ওয়ারুণার বুকে ভিড় জমাতে লাগলো পেশাদার ও অপেশাদার শিকারীর দল, কিন্তু ব্যর্থতার ক্রমান্বয় পুনরাবৃত্তি ছাড়া অন্য কিছু বাস্তব লাভ হল না।

ওয়ারুণা উপত্যকার মেষরক্ষকদের মনে তখন জমে উঠেছে হতাশার ঘন মেঘ,

এমন সময় একদিন অকুস্থলে এসে হাজির হল জনৈক স্থানীয় শিকারী। প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখা ভাল যে এই শিকারীটি কিন্তু শ্বেতাঙ্গ ছিল না, সে ছিল অস্ট্রেলীয়ার স্থানীয় আদিম অধিবাসী। উপরন্তু সে ছিল একজন বর্ণসঙ্কর।

"রেড কিলার" সম্পর্কে যাবতীয় ঘটনাবলী শুনে নিয়ে শিকারীটি তার প্রয়োজন জানাল—

—"গুড়! গুড় আছে ?" ওয়াকুণার পশুপালককে প্রশ্ন করে লোকটি।

—"হ্যাঁ, তা আছে। কিন্তু..." হতভম্বের মত উত্তর দেয় পশুপালক ভদ্রলোক।

—"তাহলে আর চিন্তা নেই", বেশ কিছুটা উৎফুল্ল ভাবেই বলে শিকারীটি "এবারে রেড কিলার নির্ঘাত মারা পড়বে।"

স্থানীয় শিকারীর কৌশলটি ছিল অভিনব।

সেইদিন রাত্রে তার নির্দেশমত ভেড়াগুলোকে খোঁয়াড়ের মধ্যে না রেখে প্রান্তরের উপরই ছেড়ে রাখা হল। যদিও ঐ প্রান্তরকে বেষ্টন করে ছিল সুকঠিন লৌহ-জালের প্রতিরোধ কিন্তু বিগতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, ঐ জাল কেটে চারণভূমিতে ঢুকে ভেড়া মারতে কোনদিনই "রেড কিলার" অসুবিধা বোধ করে নি।

শিকারীর নির্দেশে বেষ্টনীকে ঘিরে আশেপাশের অনেকখানি জায়গা জুড়ে এইবার ছড়িয়ে দেওয়া হল ঘন তরলীকৃত গুড়, যার ফলে কোন ভূ-চর প্রাণীর পক্ষেই গুড়ের উপর পদার্পণ না করে ভেড়াগুলোর নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল না। গুড়ের উপর পা পড়লে চটচটে গুড় পায়ে আটকে যায় এবং কুকুর জাতীয় প্রাণীর স্বভাব অনুযায়ী তারা পায়ের থাবা চেটে চেটে ঐ অস্বস্তিকর পদার্থটাকে দূর করতে চায়। গুড়ের মিষ্টিস্বাদ ভাল লাগার ফলে স্বাভাবিক কারণেই সে আরও বেশি গুড় চেটে চেটে খেতে শুরু করে। ঠিক এই পশু মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই স্থানীয় শিকারীটি তাঁর ফাঁদ পেতেছিল।

শিকারীটির নির্দেশমত সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ওয়াকুণার পশুরক্ষক যখন সেদিন রাত্রে শুতে গেলেন তখন তাঁর মানসচক্ষে ভেসে উঠছিল পরদিন প্রত্যুষে চারণভূমির উপর ইতস্ততঃ ছড়ানো আরও কতকগুলি নিরীহ ভেড়ার মৃতদেহ।

সারারাত কোনক্রমে কাটিয়ে পরদিন খুব ভোরে অনুসন্ধান দল নিয়ে চারণ-ক্ষেত্রে ছুটে গেলেন পশুপালক। সামান্য কিছুক্ষণের অনুসন্ধানে চোখে পড়ল একটি মৃতদেহ—লৌহজালের বেষ্টনীর ঠিক পাশে।

শিকারী তার কথা রেখেছে। তীব্র বিষ "গ্রাউণ্ড সায়ানাইড" মিশ্রিত গুড়ের ফাঁদে পা দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে উপত্যকার বিভীষিকা "রেড কিলার"।

গ্রীক্ পুরাণের নায়ক হারকিউলিস।

দেবরাণী জুনোর চক্রান্তে মানবশ্রেষ্ঠ হারকিউলিসকে বরণ করতে হয়েছিল 'আর্গোর' সম্রাটের দাসত্ব। কিন্তু ভৃত্যের মত নতশিরে রাজাদেশ পালন করার ব্রত নিয়ে পৃথিবীর বুকে বজ্রপেশী হারকিউলিসদের জন্ম হয় না; 'আর্গোর' সম্রাটও বুঝতে পারলেন সে কথা—

কিন্তু এত সহজে হারকিউলিসকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে রাজী হলেন না তিনি—আরোপ করলেন এক কঠিন শর্ত।

শর্তানুসারে, হয় সম্রাটের প্রদেয় বারোটি দুঃসাধ্য কার্য সম্পাদন করে হারকিউলিস আপন দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন করবেন; নচেৎ, চিরদিনের মত তাকে হয়ে থাকতে হবে সম্রাটের আজ্ঞাবহ।

হারকিউলিস নির্দ্বিধায় মেনে নিলেন সেই শর্ত—তারপর!

গ্রীস্‌দেশের উপকথায় বর্ণিত আছে, তারপর কেমন করে হারকিউলিস তাঁর

অসীম শক্তি এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে একে একে সম্পাদিত করেছিলেন আর্গোর রাজার দেওয়া বারোটি দুরূহ কাজ। কেমন করে আপন ক্ষমতাবলে মোচন করেছিলেন আপনার দাসত্ব।

কিন্তু এ তো গেল পুরাণের কথা—তবে, হারকিউলিসদের দেখা শুধু পুরাণের পাতাতেই মেলে না।

যুগে যুগে পুরাণ বা উপকথার জগৎ থেকে হারকিউলিসের দল নেমে আসে বাস্তবের পৃথিবীতে—অসীম শক্তি এবং বুদ্ধিবলে এই বৃষস্কন্ধ মানুষগুলো জীবন সংগ্রামের বন্ধুর—কঠিন পথে রচিত করে যায় আশ্চর্য সব অবিশ্বাস্য কাহিনী সভ্য সমাজের হাজারো নিয়মের মাঝখানে, যার ফলে এদের মনে হয় খাপছাড়া, বেমানান, দুর্বিনীত—

এমনই দু'টি ব্যতিক্রম চার্লস কটার ও বিলি প্যারোট। আমাদের প্রথম কাহিনীটির নায়ক চার্লস কটার নামক একটি অদ্ভুত মানুষ, মানুষ না বলে বরং যাকে 'অমানুষিক মানুষ' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে; অন্ততঃ কাহিনীর মধ্য দিয়ে বারবার আমাদের একথাই মনে হবে বলে আমার বিশ্বাস—

চার্লস কটার

বিখ্যাত শিকারী জন হান্টারের জীবনকাহিনীর পাতা থেকে আমাদের বর্তমান ঘটনাটি এখানে বিবৃত করা হল—এছাড়া ছোট্ট একটি ঘটনা চার্লস কটারের পুত্র শিকারী বাড কটারের বিবরণী থেকে সংগৃহীত—

'শ্বেত শিকারীর' পেশা অবলম্বন করে আফ্রিকায় জীবিকানির্বাহ করলেও চার্লস কটারের জন্মভূমি ছিল আমেরিকার ওকলাহামা প্রদেশে। এমনকি আফ্রিকায় আসার আগে বেশ কিছুদিন সে ওকলাহামা প্রদেশের শেরিফের পদেও নিযুক্ত হয়েছিল।

যে সময়কার কথা বলছি, সে সময়ে ঐ অঞ্চলে যারা বাস করতো তাদের মোটেই 'অত্যন্ত ভদ্র এবং সজ্জন ব্যক্তি' বলে অভিহিত করা যায় না, বিশেষ করে যখন তাদের অধিকাংশের জীবনদর্শন, মুখনিঃসৃত বাক্যের বদলে কোমরে ঝোলানো রিভলবার অথবা মুষ্টিবদ্ধ হস্তের মুষ্টিযোগের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। ঐ চমৎকার অঞ্চলটিতে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ঠিক যে ধাঁচের মানুষ প্রয়োজন, চার্লস কটার ছিল অবিকল সেই ধাঁচের। তার জীবনদর্শনেও বিশেষ কোন জটিলতা ছিল না, এবং স্থানীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের মতে সেও ছিল সমানভাবে বিশ্বাসী। কিন্তু আশ্চর্য্য! তা সত্ত্বেও ওকলাহামার গুণ্ডারা কটারকে বিশেষ

পছন্দ করতো না. বরং অচিরেই তারা বুঝে নিয়েছিল যে চিতাবাঘের মত চট-পটে, ছফু'ট চার ইঞ্চি লম্বা মানুষটা যতদিন শেরিফ রয়েছে, ততদিন একটু চুপচাপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ফলে, 'শ্বেতশিকারীর' পেশাকে আশ্রয় করে এবং শেরিফের পদে ইস্তাফা দিয়ে চার্লস কটার যখন আমেরিকা থেকে আফ্রিকার বুকে পাড়ি জমাল তখন স্বাভাবিক কারণেই ওকলাহামার গুণ্ডারা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

শ্বেতশিকারীর পেশায় পয়সা থাকলেও জীবনের ঝুঁকি বড় বেশী।

শিকারের নেশায় কিম্বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকনের আশায় প্রতিবছরই বহু বিদেশী বা ধনী ব্যক্তিদের আগমন ঘটে আফ্রিকার অরণ্য প্রদেশে। অরণ্যের অভ্যন্তরে অজস্র জানা-অজানা বিপদের কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাঁরা নিয়োগ করেন পেশাদার দক্ষ শিকারীদের। নিয়োগকর্তার সম্পূর্ণ নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পিত থাকে ঐ পেশাদার শ্বেতশিকারীদের উপর।

কটারের কাছে এই বিপজ্জনক পেশা ছিল তার মনের মত চাকরি।

শিকারীজীবনে একটি জানোয়ারের প্রতি কটারের তীব্র ঘৃণা ছিল এবং সেটি হল আফ্রিকা মহারণ্যের সবচেয়ে বিপজ্জনক জানোয়ার—লেপার্ড বা চিতাবাঘ।

প্রসঙ্গক্রমে এইখানে জন্তুটার একটু পরিচয় দেওয়া যাক। হলদের ওপর কালো বুটিদার গাত্রচর্মের অধিকারী এই জন্তুটির গড় ওজন প্রায় দু'শ পাউণ্ডের মত হয়ে থাকে। বিড়ালগোষ্ঠীর প্রাণীদের মধ্যে বিপুলবপুর অধিকারী না হলেও ক্ষিপ্রতা এবং আক্রমণের কৌশলগত দিক দিয়ে বিচার করলে লেপার্ড অদ্বিতীয়।

বিড়ালগোষ্ঠীতে বুটিদার জানোয়ারের সংখ্যা একাধিক। শুধুমাত্র লেপার্ড-ই নয়, জাগুয়ার, প্যান্থার এবং 'চিতা'-র গায়েও রয়েছে হলদে-কালোর নামাবলী।

প্যান্থার এবং লেপার্ডের মধ্যকার পার্থক্য জীবতত্ত্বের নিখুঁত গবেষণার বিষয়, যা অজ্ঞাত থাকলেও আমাদের আপাততঃ খুব বেশী ক্ষতি বৃদ্ধি ঘটবে না। জাগুয়ার দক্ষিণ আমেরিকার বাসিন্দা, আকৃতিগত দিক দিয়েও লেপার্ডের সঙ্গে জাগুয়ারের বৈসাদৃশ্য অনেক। সাঁতারে সুদক্ষ জাগুয়ারের মুখটা গোল হাঁড়ির মত, লেপা-র্ডের তুলনায় সে খানিকটা উঁচুও বটে। কিন্তু ভারতবর্ষে 'লেপার্ড' প্রধানতঃ চিতাবাঘ নামেই পরিচিত। আর যাঁরা প্রকৃতিপড়ুয়া বা জীবতাত্ত্বিক নন, তাঁদের অনেকেই এই নামটিকে কেন্দ্র করেই 'চিতা' এবং চিতাবাঘের বা লেপার্ডের মধ্যে প্রায়শঃই গুলিয়ে ফেলেন।

ভারতবর্ষেও লেপার্ড বাস করে এবং তাদের আকৃতিও বৃহৎ, কিন্তু 'চিতা' বা

'Cheeta' নামক যে জীবটি আফ্রিকার অরণ্যে ঘুরে বেড়ায় তার সঙ্গে লেপার্ডের কোন তুলনাই হয় না।

দ্রুতগামী, লাজুক এবং খানিকটা ভীরু প্রকৃতির 'চিতা' বিড়াল ও কুকুর উভয় গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ। ফলে, গাত্রচর্ম বা মুখাবয়ব অতিকায় মার্জারদের মত হলেও পেশীর বিন্যাস বা পায়ের থাবা তার সারমেয় সদৃশ। অন্যদিকে সুঠাম গঠনের লেপার্ডের পেশীতে ও থাবায় খুঁজে পাওয়া যায় হিংস্র শ্বাপদ-ক্ষিপ্রতা। দেহ-চর্মের বিচারেও লেপার্ড ও চিতার পার্থক্য লক্ষ্যণীয়—লেপার্ডের দেহকে আবৃত ক'রে হলুদ জমির উপর রয়েছে কালো চাকা চাকা দাগের আলপনা, ইংরাজিতে যাকে বলে 'রোসেট' বা 'রোজেট', পক্ষান্তরে চিতার দেহের শ্রীবৃদ্ধি করেছে অজস্র কালো কালো ফোঁটা, যার ইংরাজি পরিভাষা 'স্পট্‌স্'। চিতার দু'চোখের কোন দিয়ে মুখের উপরিভাগ পর্যন্ত নেমে এসেছে দু'টি কালো দাগ, যা কিনা লেপার্ডের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

সুতরাং, নামের জন্য ভুল হলেও, আকৃতি বা প্রকৃতির দিক দিয়ে 'লেপার্ড এবং 'চিতা' দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন জানোয়ার। কিন্তু তা বলে এই লেপার্ডের উপর কটা-রের তীব্র বিদ্বেষ এবং ঘৃণার কারণ কী?

কটারের অস্বাভাবিক লম্বা এবং বলিষ্ঠ দু'টি নগ্ন বাহুকাণ্ডের উপর দৃষ্টিপাত করলেই কারণ বুঝতে দেরী হয় না। হিংস্র লেপার্ডের নখ ও দাঁতের হৃদ্যতাপূর্ণ আলিঙ্গনের ফলেই যে সুদীর্ঘ এবং গভীর ক্ষতচিহ্নগুলির সৃষ্টি হয়েছে, অভিজ্ঞ মানুষ মাত্রই সেকথা উপলব্ধি করেন।

কিন্তু এ তো হল লড়াইয়ের পরিণাম—

লড়াইয়ের বিবরণীর সন্ধান পেতে হলে আমাদের আশ্রয় করতে হবে জনৈক শ্বেতশিকারীর আত্মকথা, যাঁর নাম আমরা কাহিনীর প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছি—

কুকুরের মাংস লেপার্ডের খুব পছন্দ। শিকারীরাও তাই মরা কুকুরের টোপ দিয়ে লেপার্ড শিকার করে থাকেন। কটারেরও অজানা ছিল না কথাটা।

তাই একদিন বনের মধ্যে একটা গাছের উপর মরা কুকুরের দেহটাকে ঝুলিয়ে রেখে কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে রাইফেল হাতে নিয়ে আত্মগোপন করে শিকারের অপেক্ষা করছিলেন কটার। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মরা কুকুরের গন্ধ ছড়িয়েছে বনের মধ্যে, আর সেই গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে একটু পরেই অকুস্থলে এসে হাজির হল একটা লেপার্ড।

কটারের খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু জন্তুটাকে দেখামাত্রই তার মেজাজ গেল

বিগড়ে। জন্তুটার গায়ের চামড়াটা মোটেই লোভনীয় নয়, কেমন ফ্যাকাসে। তার মানে বাঘটা লোকালয়ের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, গভীর অরণ্যের বাসিন্দা-দের মত উজ্জ্বল দেহচর্মের মালিকানা থেকে এ বঞ্চিত।

লেপার্ড কিন্তু এত সব মোটেই ভাবছে না। তার ভাবার কথাও নয়, কারণ তার নাগালের মধ্যে বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন হয়ে ঝুলছে একটি মরা কুকুরের দেহ, আর সেই লোভনীয় মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে যখন তার রসনা ক্রমেই লালায়িত হয়ে উঠছে।

কিন্তু চিতাবাঘ বড়ো চালাক জানোয়ার। ভাল করে চারদিক দেখেশুনে নিশ্চিন্ত হয়ে তবেই সে কুকুরটার দিকে চোখ দিল। ধীরে ধীরে গুঁড়ি মেরে জমির উপর বসে পড়ে সে লাফ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হল।

ওদিকে চার্লস কটারের মেজাজ তখন ক্রমেই সপ্তমে চড়ছে। সে প্রথমে ভেবেছিল যে, হতভাগা বিড়ালটা বোধহয় একটু দেখে-টেখে তারপর চলে যাবে, কিন্তু লেপার্ডটা যখন কুকুরের মৃতদেহটাকে গাছের উপর থেকে নামিয়ে আনতে উদ্যোগী হল তখন আর কটারের সহ্য হল না।

হাতের রাইফেল মাটিতে নামিয়ে রেখে সে ছুটে গিয়ে পিছন থেকে লেপার্ডটার দুটো পা চেপে ধরল, আর তার পরই এক প্রচণ্ড আছাড়।

কটার ইচ্ছা করলে জন্তুটাকে অনায়াসে গুলি করে মারতে পারত। কিন্তু সম্ভবতঃ জানোয়ারটার উপর প্রচণ্ড আক্রোশ পোষণ করার ফলেই সে খালি হাতে ছুটে গেছিল।

আছাড় খেয়ে লেপার্ডটা হতভম্ব হয়ে গেছিল। তার পিতৃপুরুষের কাছে কোথাও সে এই ধরনের অভিজ্ঞতার গল্প শোনে নি। এই আক্রমণের কায়দাটা তার কাছে একেবারেই নতুন, বিশ্রী।

কিন্তু আফ্রিকা মহারণ্যের সবচেয়ে বিপজ্জনক জানোয়ার লেপার্ড নিরস্ত্র মানুষের হাতে আছাড় খেয়ে পালিয়ে যাওয়ার পাত্র নয়।

মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বিদ্যুতের মত সে প্রতি-আক্রমণ করল। এই আক্রমণের চকিত ক্ষিপ্রতায় শিকারী তার রাইফেল তুলবার সময় পায় না, দ্রুতগতি বেবুন বৃক্ষশাখা থেকে লুটিয়ে পড়ে ভূমিপৃষ্ঠে গরিলার চোখের উপর দিয়ে উধাও হয়ে যায় ভূমিষ্ঠ শিশু, কিন্তু এবার লেপার্ড শত্রুর নাগাল পেল না।

বজ্রের মত দু'টি অস্বাভাবিক লম্বা হাত চিতাবাঘের কণ্ঠনালী চেপে ধরল। ঝটাপটি করতে করতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই গড়িয়ে পড়ল মাটির উপর। সনখ থাবার

রক্ত সঞ্চালনে রক্তাক্ত হয়ে উঠল কটারের দুটো হাত ও নিম্নাঙ্গ, কিন্তু তার হাতের চাপ একটুও শিথিল হল না।

মানুষের আদিমতম অস্ত্র এবং অরণ্যচারী পশুর বন্যবিক্রমের দ্বৈরথে অবশেষে চার্লস কটারই জয়ী হল।

বজ্রমুষ্টির কঠিন নিষ্পেষণে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করল লেপার্ড। যুদ্ধ শেষ।

কিন্তু কটার তখন রীতিমত আহত।

তার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরে পড়ছে উষ্ণ রক্তের ধারা, লেপার্ডের শাণিত নখর দেহের একাধিক স্থানে সৃষ্টি করেছে সুদীর্ঘ ও গভীর ক্ষতচিহ্নের। ফলে বাড়ী ফিরে এখনই ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, না হলে ক্ষত বিষিয়ে যেতে পারে—তারপর আপাততঃ বেশ কিছুদিন টানা বিশ্রাম।

কিন্তু আমরা তো বলতে বসেছি চার্লস কটারের কথা। ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য কটারের ক্ষেত্রে সেগুলো খাটে না।

তাহলে কটার কি করলো।

ক্ষতস্থানগুলোতে একটা মোটামুটি ব্যাণ্ডেজ মত করে সে অপেক্ষা করতে লাগল পরবর্তী শিকারের জন্য।

অবশ্য এবার আর তাকে হতাশ হতে হয়নি। কুকুরের মাংসের গন্ধে এবার যে লেপার্ডটা এসে আবির্ভূত হল, সেটা আকৃতিতে যেমন বড় সড়, তেমনি গায়ের চামড়াটিও তার ভারী সুন্দর। রাইফেলের একটি গুলিতেই শিকারপর্ব সমাধা হয়ে গেল।

জীবজগতে প্রতিশোধ নেওয়ার ঘটনা নতুন নয়। বহুক্ষেত্রেই এ ধরনের কাহিনীর খোঁজ মেলে। আমাদের পূর্বোক্ত ঘটনার বেশ কয়েকদিন পরে কটার যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেলেও তাকে প্রতিশোধ চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা বলেই মনে হয়—

সেদিন জঙ্গলের পথ দিয়ে হাঁটছিলেন কটার। আচম্বিতে পিছন থেকে দু'টি ছোট জাতের লেপার্ড তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জন্তুদুটো কটারের মাথার উপরে বৃক্ষশাখায় লতাপাতার আড়ালে আত্মগোপন করে ছিল। এমন অতর্কিত আক্রমণের জন্য কটার প্রস্তুত ছিল না। সে বুঝতে পারল যে হাতের রাইফেল আর তার কাজে লাগবে না। উপরন্তু ততক্ষণে শ্বাপদের দাঁত ও নখের আক্রমণে তার সর্বাঙ্গ হয়ে উঠেছে রক্তাক্ত।

উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে কটার চকিতে পাল্টা আক্রমণ করল। তার আগেই সে রাইফেল ফেলে দিয়ে হাতদুটোকে মুক্ত করে নিয়েছিল। বাঘদুটো এই দ্রুত প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, শত্রুর পায়ের কাছে জমিতে তারা ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নীচু হয়ে কটার একটা লেপার্ডের গলা চেপে ধরল।' বজ্র-পেষণে লেপার্ডটার চোখে তৎক্ষণাৎ রক্ত জমে গেল, কিন্তু শাণিত কিরীচের মত তার নখগুলো নিশ্চেষ্ট রইল না। কটারের সর্বাঙ্গ হয়ে উঠল রক্তাক্ত।

কটার একটা লেপার্ডের সঙ্গে লড়াই করছে, এমন সময়ে পিছন থেকে দ্বিতীয় লেপার্ডটা শত্রুর পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করে লাফ দিল। মুহূর্তের জন্য লড়তে লড়তে কটার একটু ঝুঁকে পড়েছে, ফলে লেপার্ডের লাফটা ফস্কে গেল। কটারের পিঠে না পড়ে সে এসে পড়ল তার আক্রান্ত সঙ্গীর পিছনের পায়ের উপর। কটারের কবলে তখন লেপার্ডটা ছটফট করছে মুক্তি পাওয়ার জন্য। সনখ থাবার একটি আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে গেল দ্বিতীয় চিতাবাঘটার পেট। কটার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ল না। আরেকটা হাত দিয়ে দ্বিতীয় জন্তুটাকেও প্রাণপণে চেপে ধরলো জমির উপর।

কিন্তু আকৃতির অনুপাতে অনেক বেশী শক্তিশালী লেপার্ডের পেশীগুলো স্প্রিং-এর মত মাটি থেকে ঠেলে উঠতে সচেষ্ট হল। ফলে চার্লস কটারের পক্ষেও দু-দুটো জন্তুকে চেপে ধরে রাখা সম্ভব হল না। ফলে কটারকে দাঁড়িয়ে উঠতে হল ঠিকই, কিন্তু তার লৌহ অঙ্গুলীর বন্ধন জন্তুদুটোর গলার উপর এতটুকুও শিথিল হল না।

কটারের বাহু এবং কাঁধের ক্ষতস্থান থেকে তখন ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। কিন্তু অবিরাম রক্তক্ষরণে অবসন্ন হয়ে আসার বদলে, সে যেন রক্তলোলুপ বাঘের মতই দ্বিগুণ শক্তিতে লড়তে লাগল। দু'হাত দিয়ে দু'টো লেপার্ডকে শূন্যে তুলে ধরে সে ক্রমাগত দু'টোকে মাথা ঠুকে দিতে লাগল। অবিশ্বাস্য দৃশ্য!

কটারের সঙ্গে যে নিগ্রো সঙ্গীরা ছিল, তারা প্রথমে পালিয়ে গিয়েছিল, এতক্ষণে তারা ফিরে এসেছে। গুলি করবার উপায় নেই, নিক্ষিপ্ত বুলেট কটারের গায়ে লাগতে পারে। বিস্ফারিত ভীত দৃষ্টিতে তারা নিশ্চেষ্ট হয়ে দেখতে লাগল মহাকায় এক মানুষের সাথে দু-দু'টো হিংস্র শ্বাপদের মরণপণ লড়াই। এক নিদারুণ সহ্যশক্তির পরীক্ষা।

চার্লস কটারের রক্তস্নাত দেহে অফুরন্ত শক্তির জোয়ার। একটু পরেই তার

মনে হল লেপার্ড দু'টো কেমন যেন অবসন্ন হয়ে আসছে। তাদের থাবায় অথবা দাঁতের জোর যেন কমে এসেছে।

বিজয়ীর আনন্দে চীৎকার করে উঠল কটার।

বিদীর্ণ উদর লেপার্ডটার ক্ষতস্থান দিয়ে অবিরাম রক্ত ঝরে পড়ছিল রণস্থলের ঘাসজমির উপর, শ্বাসনলীর উপর কঠিন নিষ্পেষণে অন্যটিও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল।

লড়াইয়ের কায়দাটা এবার একটু পালটে নিল কটার। মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করে দুই বাহুকে সোজা করে সে দাঁড়িয়ে উঠল, ফলে লেপার্ড দুটো আর তার শরীর স্পর্শ করতে পারল না। তারপর অদূরবর্তী একটা গাছের কাছে গিয়ে গুঁড়িতে জন্তু দুটোর মাথা ঠুকতে লাগল সমস্ত শক্তি দিয়ে।

মাথার উপর প্রচণ্ড আঘাত—কণ্ঠনলীতে লৌহকঠিন নিষ্পেষণ—

ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এল দু'টি শ্বাপদ।

মৃতপ্রায় জন্তুদুটোকে মাটিতে আছড়ে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল কটার।

যুদ্ধ শেষ !

চার্লস কটার অসাধারণ মানুষ। সে শুধু নিয়মেরই ব্যতিক্রম নয়, সে ব্যতিক্রমেরও ব্যতিক্রম।

চার্লস কটারের দুই পুত্র মাইক এবং বাড কটার পিতার মতই 'শ্বেত-শিকারীর' পেশা গ্রহণ করেছিল। মাইক কটারের স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়েই আমরা চার্লস কটার নামক নরদানবের আর একটি ছোট্ট কাহিনী জানতে পারব—

"কেপ-বাফেলো"

আফ্রিকা মহারণ্যের দুর্বিনীত, অবাধ্য সন্তান।

কালবৈশাখীর মেঘের মত গায়ের রঙ, পেশীবহুল প্রশস্ত কাঁধ, বিপুল বপু—ওজনে প্রায় একটনের কাছাকাছি, মাথায় মধ্যযুগীয় যোদ্ধাদের শিরস্ত্রাণের মত হাড়ের আবরণ (Boss of the horn), আর সেই শিরস্ত্রাণের দুই প্রান্ত শোভিত করে বিস্তৃত দুটি ভয়ংকর শিং।

এ তো গেল আকৃতি, আফ্রিকার কেপ-বাফেলোর প্রকৃতি আরো ভয়াবহ।

গণ্ডার বা হাতি অতিকায় দেহের অধিকারী হলেও তাদের দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ, পক্ষান্তরে লেপার্ড বা সিংহ প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদের চোখ এবং কান অত্যন্ত প্রখর হলেও ঘ্রাণশক্তি খুবই কম। বন্যমহিষের ঘ্রাণ, শ্রবণ এবং দৃষ্টির প্রখরতায় রচিত

হয়েছে মারাত্মক ত্র্যহস্পর্শ। সম্পূর্ণ অকারণে আক্রমণ করে বুনো মহিষ তার হত্যালীলা মিটিয়েছে এমন ঘটনা বিরল নয়। প্রথম আক্রমণের মুখে শত্রুকে আঘাত হানতে না পেরে গণ্ডার বা হাতী অনেক সময়েই ঘুরে এসে পুনরায় আক্রমণ করে না, কিন্তু কেপ-বাফেলো সে পাঠশালার ছাত্র নয়, বিদ্যুদ্বেগে তার বিশাল দেহটাকে সঞ্চালিত করে বারংবার সে শত্রুর দেহে আঘাত হানে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হচ্ছে, ততক্ষণ তার আক্রমণে ভাটা পড়ে না।

'কেপ-বাফেলো'-র বুদ্ধি কিন্তু তার দেহের স্থূলতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বুনো মহিষ অতি ধূর্ত জানোয়ার। ঘন-জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে সে অস্ত্রধারী মানুষকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে, তারপর একসময় অতর্কিতে ঝড়ের মত আক্রমণ করে বসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিকারী রাইফেল তোলার অবকাশ পায় না, নিষ্ঠুর শিং-এর আঘাতে ধরাপৃষ্ঠে লম্বিত হয় তার রক্তাক্ত মৃতদেহ।

চার্লস কটার খুব ভালভাবেই অবহিত ছিলেন বুনো মহিষ বা ম'ঘোগো (স্থানীয় ভাষা) সম্পর্কে, কিন্তু অরণ্যপথে চলতে চলতে মহিষটা যখন তাঁকে অভাবিতভাবে আক্রমণ করে বসল, তখন ঐ পুস্তকলব্ধ জ্ঞান তাঁর বিশেষ কাজে লাগল না। ঝড়ের মত ছুটে এল মহিষ—মুহূর্তের জন্য কটারের দৃষ্টিপথে ধরা দিল এক কৃষ্ণবর্ণ জান্তব বিভীষিকা। হত্যার উদগ্র উন্মাদনায় উন্নীত দুটি বিশাল শৃঙ্গ। বন্দুক তুলে নিশানা করার সময় পেলেন না কটার, কোনক্রমে ট্রিগারে চাপ দিলেন।

গুলি মহিষের মর্মস্থানে কামড় বসাল না—লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

পরক্ষণেই প্রচণ্ড আঘাতে কটার ছিটকে পড়লেন।

নিশ্চিত মৃত্যু।

আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শিং ও খুরের নিষ্ঠুর আঘাতে পিষ্ট হয়ে যাবে তাঁর দেহ। আফ্রিকার নিষ্করুণ প্রান্তরের বুকে শিকারীর দুর্ভাগ্যের চিহ্ন হিসাবে শুধুমাত্র পড়ে থাকবে রক্তাক্ত এক তাল মাংসপিণ্ড এবং ছিন্নবিচ্ছিন্ন পরিধেয়। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে কটার তাঁর পিঠের নীচে অনুভব করলেন তৃণভূমির ঘাসে ঢাকা জমি।

কিন্তু নিশ্চিতকে অনিশ্চিত প্রমাণ করতেই কটারের জন্ম—এত সহজে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে তিনি রাজী হলেন না।

মহিষ তখন কটারের উপর এসে পড়েছে! চরম আঘাত হানবার জন্য শৃঙ্গে

আন্দোলিত হল যমদণ্ডের মত দুটি শিং। তারপর নেমে এল শত্রুর ভূপাতিত দেহ লক্ষ্য করে। পশুরাজ সিংহের সনখ থাবার প্রচণ্ড চপেটাঘাত যে স্ফীত স্কন্ধদেশে সামান্য কয়েকটা আঁচড়ের বেশী কিছু কাটতে অক্ষম, 'কেপ-বাফেলো'র শৃঙ্গাঘাতের সেই উৎসশক্তি, এবার কিন্তু শিকারীর দেহ স্পর্শ করতে পারল না। মহিষের শৃঙ্গ শোভিত মস্তক এবং ভূপাতিত মনুষ্যদেহের মাঝখানে প্রাচীর সৃষ্টি করতে সক্রিয় হল দুটি বলিষ্ঠ পা।

মুখের উপর পড়ছে উন্মত্ত মহিষের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস। দুটো পা মহিষের কাঁধ ও গলায় স্থাপন করে আঘাত প্রতিহত করার ফাঁকেই একহাতে রাইফেল তুলে নিলেন কটার।

না, এবার আর ভুল হল না। একটি গুলিতেই মৃত্যুবরণ করল আফ্রিকার মহিষাসুর।

দুর্দম শক্তিধর কটার। আক্রমণোদ্যত কেপ-বাফেলোকে দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে আটকে রাখার কাহিনী পৃথিবীতে বিরল। হারকিউলিস, স্যামসন, ইউলিসিস বা টারজান কি কটারের চেয়েও শক্তিশালী ?—কাহিনীর পাঠক পাঠিকারাই সে বিচার করবেন।

সৃষ্টিছাড়া চার্লস কটারের মৃত্যুও হয়েছিল অস্বাভাবিকভাবে—একটা সামান্য যান্ত্রিক ত্রুটির ফলে। 'অমানুষিক মানুষ'-টির কথা বলতে বসে উপসংহারে এই কাহিনীটি না বললে হয়ত অনেক কিছুই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পৃথিবীতে যে মানুষ যত গতানুগতিক নিয়মতান্ত্রিকতাকে অতিক্রম করে চলে, ভাগ্যদেবীও বোধ করি তার ললাটে ততই দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময় লিপি লিখে যান। কটারের জীবনদীপ নির্বাপিত হওয়ায় কাহিনী তাই অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর।

বুকে ক্যামেরা ঝুলিয়ে রাইফেল হাতে কটার জঙ্গলে ঘুরছিলেন, উদ্দেশ্য অরণ্য জীবনের কোন কোন বিশেষ মুহূর্তকে চিরতরে ধরে রাখবার যদি কিছু সুযোগ মেলে। সোজা কথায় "ফটো তোলা"।

ক্যামেরার যে অংশের মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তু বা তার প্রতিচ্ছবির প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত করা হয় তাকে বলে ভিউ-ফাইণ্ডার (**View-Finder**)। কটারের ক্যামেরার ঐ ভিউ-ফাইণ্ডারটা খারাপ ছিল। সামান্য যান্ত্রিক ত্রুটি নিয়ে ক্যামেরার মালিকও বিশেষ মাথা ঘামায় নি, কিন্তু তার ফল হল বড় মর্মান্তিক।

জঙ্গলের পথে চলতে চলতে হঠাৎ কটারের চোখে পড়ল একটা গণ্ডার। আকারে বেশ বড়সড়। রাইফেল রেখে তিনি জন্তুটার ছবি তুলতে সচেষ্ট হলেন।

বদ্ মেজাজী বলে গণ্ডারের খুব অখ্যাতি নেই। কিন্তু একটা অদ্ভুত ধরনের জিনিস তাক করে ধরে কটারের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির রকমটা ভাল লাগল না তার। সে তাড়া করে এল কটারের দিকে।

ক্যামেরার যন্ত্র-চক্ষুর মধ্য দিয়ে চার্লস দেখছে। গণ্ডার অনেক দূরে আছে, কিন্তু আসলে তখন জন্তুটা খুব কাছে এসে পড়েছে। কটার যখন তার বিপদ উপলব্ধি করল তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। গণ্ডারের খড়্গ প্রায় তার দেহ স্পর্শ করেছে।

একবার মাত্র গুলি চালাবার সুযোগ পেয়েছিল কটার। তারপরই গণ্ডারের সুদীর্ঘ খড়্গ তার দেহটাকে বিদ্ধ করে দিল।

জীবনযুদ্ধের বিজয়ী সৈনিক চার্লস কটার মৃত্যুর কাছেও পরাজয় বরণ করে নি।

একটিমাত্র গুলিতেই কটারের মৃত্যুদূত ভূমিশয্যা গ্রহণ করেছিল।

ওকলাহামার দুর্ধর্ষ মানুষটি অবশেষে চিরশান্তি লাভ করল আফ্রিকা মায়ের কোলে।

বিলি প্যারোট

টোয়েনকে ডিড্‌ল্ ওঃ! টোয়েনকে ডিড্‌ল ওঃ! টোয়েনকে ডিডল ইডল্ ইডল্ ও!

না, কোন সাংকেতিক ভাষা নয়—বিলি প্যারোট-এর প্রিয় গানের ছত্রের দুটি লাইন। গান বহুজনেরই প্রিয় এবং প্রত্যেকেরই দু'টি বা একটি বিশেষ গান অপেক্ষাকৃত বেশী প্রিয় হয়ে থাকে, কিন্তু বিলি প্যারোট নামক খর্বাকৃতি মানুষটা যখনই অন্যমনস্ক হয়ে এই গানটার কলি মনে মনে গুণ গুণ করে গাইতো—তখনই সম্ভবতঃ তার মনে ভেসে উঠতো এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা—'বাঁকুড়া জেলার নিবিড় অরণ্যানীর পটভূমিতে এক হিংস্র শ্বাপদ ও একটি দরিদ্র, মিষ্টভাষী, খর্বাকৃতি মল্লযোদ্ধার মধ্যে সংঘটিত বিচিত্র এক দ্বৈরথের কাহিনী।

অরণ্যজীবনকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাস, রক্তজমানো কাহিনীর সংকলন হিসাবে যুগে যুগে লেখা হয়েছে, বৈচিত্র্যের বিচারে আমাদের বর্তমান কাহিনীর স্থান অবশ্যই সেই ঐতিহাসিক সূচীপত্রের উপরের ভাগে।

এখন, কে এই বিলি প্যারোট?

পাঠকের কাছে এখনও তার পরিচয় অজ্ঞাত। কিন্তু কাহিনীর সূচনায়

পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া বোধকরি আবশ্যক এবং প্রসঙ্গতই হবে।

বন্ধু প্যাট-এর কাছে স্মৃতিচারণের অবসরে বিখ্যাত শিকারী জেম্‌স্ ইংলিস বিলি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর বর্ণনা রেখেছেন। এইখানে বলে রাখা ভাল যে, শিকারী জেম্‌স্ ইংলিস্-এর মাতৃভূমি হচ্ছে সুদূর নিউজিল্যাণ্ড। 'নীলের ব্যবসা' করতে তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন উনিশ শতকের শেষভাগে। ব্যবসায় তিনি কতটা সাফল্য লাভ করেছিলেন তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত, কিন্তু সমকালীন ভারতবর্ষের বহু অরণ্যের পটভূমিতে ইংলিস্ সাহেবের কৌতূহলী শিকারী মন যেসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছিল, পরবর্তীকালে তাঁর স্মৃতিচারণের অবসরে লেখা সেই সব কাহিনীর বর্ণনায় আমরা কখনো হয়েছি বিস্মিত, কখনো মুগ্ধ অথবা কখনোও শিহরিত। বিলি প্যারোটের সঙ্গে ইংলিস সাহেবের পরিচয় ঐ সময়েই—

বিলি জাতিতে ছিল স্কচ। পেশায় কামার। কিন্তু কোন পেশাকেই অবলম্বন করতে তার আপত্তি ছিল না। শোনা যায়, প্রথম জীবনে নাবিক হয়ে সে বিশ্ব-ভ্রমণ করেছিল। তারপর, সে কাজে ইস্তফা দিয়ে গোটা পঞ্চাশেক টাকা মাইনেয় কোলকাতার ট্যাকশালে চাকরিতে ঢোকে। পরে জনৈক 'হেনরী' নামক শ্বেতাঙ্গের মালবাহক হিসাবে মাসিক একশ' পঞ্চাশ টাকা মাইনেয় বিলি "তিরহাট" এসে পৌছায়! শিকারী ইংলিস সাহেবের সঙ্গে বিলির পরিচয় এই তিরহাটেই। ছোট্টখাট্ট অথচ পেশীবহুল চেহারার, মিষ্টি স্বভাবের এই মানুষটি ইংলিস সাহেবের খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিল। উপরন্তু, বিলি ছিল অসীম শক্তিশালী একজন ওস্তাদ মল্লযোদ্ধা। যদিও তার চেহারায় বা ব্যবহারে আপাতভাবে তার কোন ছাপই পড়তো না। শরীরে শক্তিসঞ্চয় করতে বিলি প্যারোট যে বিভিন্ন পন্থার আশ্রয় নিত, তার মধ্যে একটি ছিল সত্যিই অভিনব। যেমন, বিলির একটা পোযা ভেড়া ছিল এবং মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী সেটা শিং বাগিয়ে সবেগে ছুটে এসে বিলির দেহের বিভিন্ন অংশে পাথরের মত শক্ত মাংসপেশীগুলোর উপর প্রচণ্ড জোরে ঢুঁ মারতো। এই আশ্চর্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিলি নিজের দেহে শক্তিসঞ্চয় করতো এবং একই সঙ্গে দেহের মাংসপেশীগুলিকে করে তুলতো আঘাতসহ।

ছোট্ট মানুষটির শুধুমাত্র একটি ব্যাপারেই দুর্বলতা ছিল, এবং সেটি হল মদ্য-পানে তার প্রবল অনুরাগ। শিকারী ইংলিস সাহেব পরিচয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই

জেনে গিয়েছিলেন বিলির এই দুর্বলতার কথা, কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি আপত্তিকর কিছু খুঁজে পাননি। কিন্তু পরবর্তীকালে আপত্তি নয়, বিপত্তি ঘটেছিল, এবং তা হল শুধুমাত্র বিলির প্রতি সুরার ঐ তীব্র আসক্তির জন্যই।

বিলির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার দিনকয়েকের মধ্যেই ইংলিস সাহেব ভালুক শিকারের এক নিমন্ত্রণ পেলেন, বাঁকুড়া জেলায় বাসরত তাঁর এক বন্ধু—প্রাক্তন পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-এর কাছ থেকে। অবশ্যই সখের শিকার। কিন্তু আয়োজনের ত্রুটিমাত্র ছিল না। বিলিকে সঙ্গেই নিয়ে এসেছিলেন সাহেব। এছাড়া "শিকারী" বলতে ছিলেন কোলকাতা থেকে আগত দু'-একজন ব্যারিস্টার, জনৈক ডাক্তার, স্থানীয় জেলা জজ এবং মিঃ ইংলিস-এর সহযাত্রী এক বন্ধু— "পীলার"। ঐ "পীলার" নামেই সম্ভবতঃ ভদ্রলোক বন্ধুমহলে পরিচিত ছিলেন, কারণ, ইংলিস সাহেবও অন্য কোন নামে তাঁর পরিচয় দেন নি।

স্থানীয় পুলিশদের দিয়ে নিকটবর্তী জঙ্গলের মধ্যে গাছের উপর মাচাগুলো বাঁধা হয়েছিল পরস্পরের মধ্যে গজ-পঞ্চাশেকের মত ব্যবধান রেখে। দলের মধ্যে অভিজ্ঞ শিকারী হিসাবে মিঃ ইংলিস এবং আমাদের পূর্বপরিচিত ঐ মিঃ পীলার। তারা দু'জনে উঠলেন একদম ডানদিকের মাচায়। বিলি উঠলো একেবারে বাঁদিকেরটায়। অন্যান্যরা আশ্রয় নিলেন মধ্যবর্তী মাচাগুলোয়।

"বীটার"-দের 'বীট' আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সার বেঁধে বিকট শব্দ করতে করতে তারা গোটা অঞ্চলের পশু-পক্ষী তাড়িয়ে আনছিল অপেক্ষমান শিকারীদের দিকে। যদিও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভালুক-শিকার, কিন্তু শিকার করার ব্যাপারে কোনো পশুপাখির উপরেই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিল না, ফলে "বন-তাড়ুয়াদের" তাড়ায় পলায়নপর অসংখ্য পাখি, হরিণ, বনমোরগ বা খরগোশের মত ছোটখাট জন্তুগুলির উদ্দেশ্যে প্রায়ই শিকারীদের বন্দুক অগ্নিবর্ষণ করতে লাগলো। ইংলিস সাহেব এবং তাঁর বন্ধু 'পীলার'-এর যৌথ প্রচেষ্টায় অল্পক্ষণের মধ্যেই ধরাশয্যা গ্রহণ করল একটা হরিণ, গোটাকয়েক বনমোরগ এবং ছোটখাট আরও কিছু প্রাণী। কিন্তু ভাল্লুকের সন্ধান মিললো না।

সুতরাং, দ্বিতীয়বার 'বীট' আরম্ভ হল ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। মাচার উপর রাইফেল রেখে দিয়ে, শুধুমাত্র কোমরে ঝোলানো রিভলবার নিয়েই জেম্‌স্ 'বীট' পর্যবেক্ষণ করতে গাছ থেকে নেমে মাটিতে এসে দাঁড়ালেন। বিভিন্ন দিক থেকে বিকট আওয়াজ করতে করতে বীটাররা নিকটবর্তী হচ্ছিল। হঠাৎ জেম্‌স্-এর সামনে একটা ঝোপ নড়ে উঠল। সেই সঙ্গে কাঠকুটো মাড়িয়ে কিছু একটা এগিয়ে

আসার সন্দেহজনক শব্দও কর্ণগোচর হল। মুহূর্তের মধ্যে নিজের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করলেন জেম্‌স্‌, কিন্তু বিচলিত হলেন না। কোমরের খাপ থেকে রিভলবার টেনে নিয়ে তৈরী হলেন যে কোন আকস্মিক মুহূর্তের জন্য। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝোপের মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করল—নাঃ, ভালুকনয়, বিলি প্যারোট !!!

—"শুকিয়ে চুনের ভাটি হয়ে গেলাম জেম্‌স্‌। এক চুমুক না হলে তো আর চলছে না।"

বিলি তার আবির্ভাবের কারণ জানালো।

—"এখন যে কোন সময়ে ভালুক বেরোতে পারে, আর তুমি কিনা "গলা ভেজাতে", খালি হাতে মাচা ছেড়ে নেমে চলে এলে !"—ইংলিস সাহেব বেশ খানিকটা বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলেন।

—"দুত্তোর তোমার ভালুক। আপাততঃ তর্ক না করে আমাকে আগে বোতলটা দাও।" বিলি যেন একটু বিরক্তই হল।

সুরাসক্ত বেঁটে মানুষটার সঙ্গে তর্ক করার পক্ষে স্থান ও কালটা ঠিক উপযুক্ত নয়, সম্ভবতঃ এই প্রকার কিছু চিন্তা করেই মাচার উপর থেকে জেম্‌স্‌-এর জনৈক শ্বেতাঙ্গ বন্ধু বোতলটা নীচে বিলির উদ্দেশ্যে নামিয়ে দিল। বিলিও অহেতুক সময় নষ্ট না করে দু-তিনটে লম্বা লম্বা চুমুকে বেশ কিছুটা তরল পদার্থ গলাধঃ-করণ করে বোতলটা ফেরৎ দিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাঁ দিকের অদূরবর্তী মাচার উপর থেকে ভেসে এলো স্থানীয় জেলা-বিচারপতির আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর—

"দেখুন! দেখুন! ঐ যে! একটা ভালুক।"

পরিস্থিতি চিন্তা করার সময় ছিল না। চকিতে জেমস্‌ ছুটলেন নিকটবর্তী গাছটার দিকে। বিলিও তাঁকে অনুসরণ করল।

—"আরে ঐ তো শয়তানটা।" বিলিই প্রথমে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো আর তার কথা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পলায়নে তৎপর মানুষ দু'টির সামনে আবির্ভূত হল একটা প্রকাণ্ড ভল্লুকী। তার পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করে ঝুলছে একটি ছোট্ট শাবক। মুহূর্তের ব্যবধানে রিভলবার টেনে নিয়ে গুলি চালালেন জেম্‌স্‌। গুলি শ্বাপদের চোয়াল বিদ্ধ করল ঠিকই কিন্তু তার গতি রুদ্ধ হল না, ঘুরে দাঁড়িয়ে সে তাড়া করল বিলি প্যারোটকে।

পলায়নে সচেষ্ট বিলি প্যারোটের উদ্দেশ্যে সাহায্যের চেষ্টায় জনৈক শ্বেতাঙ্গ

শিকারী মাচার উপরে শুয়ে পড়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন, যাতে ভল্লুকীকে ফাঁকি দিয়ে বিলি গাছে উঠে পড়তে পারে।" ইংলিস্ সাহেব দৌড়তে দৌড়তেই শুনতে পেলেন বিলির উদ্দেশ্যে উচ্চারিত উক্ত শিকারীটির সতর্কবাণী—"জলদি বিলি, জলদি। আর একটু জোরে, নইলে শয়তানটা তোমায় নির্ঘাত ধরে ফেলবে!"

কিন্তু বিলি নিষ্কৃতি পেল না। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সহযোগী শিকারীটির এগিয়ে দেওয়া হাতটি সে হস্তগত করতে পারল না। ফলে শেষ মুহূর্তে খর্বকায় মানুষটি ঘুরে পালাবার চেষ্টা করলো বটে কিন্তু সেই সঙ্গীণ পরিস্থিতিতে দুর্ভাগ্য-ক্রমে সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল একটা বড় গাছের শিকড়ে পা আটকে। সঙ্গে সঙ্গেই ভল্লুকী ঝাঁপিয়ে পড়লো বিলির উপর।

শ্বাপদে ও দ্বিপদে শুরু হল এক বিচিত্র মল্লযুদ্ধ। ভয়াবহ মৃত্যু-আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে দুই অ-সম প্রতিদ্বন্দ্বী গড়িয়ে চললো এক নিশ্চিত পরিসমাপ্তির দিকে। হ্যাঁ, 'নিশ্চিত পরিসমাপ্তি' কথাটা বলা হল এই কারণে যে, একটি অতিকায় ভাল্লুকীর সঙ্গে নিরস্ত্র একটি মানুষের দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরিণাম যে কি হতে পারে শিকারীদের সে সম্পর্কে সম্যক ধারণাই ছিল। বন্দুক হাতে মিঃ ইংলিস এবং তাঁর বন্ধুরা তাই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন এক বিস্ময়কর দ্বৈরথের করুণ পরিণতি। গুলি চালানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ নিক্ষিপ্ত গুলী ভল্লুকী ও বিলি দু'জনের যে কাউকেই আঘাত করতে পারে। সুতরাং, নিশ্চেষ্ট হয়ে দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন ভূমিকা তাঁদের ছিল না।

ভল্লুকীর দাঁত বড় সাংঘাতিক অস্ত্র। কিন্তু জেমস্-এর রিভলভার থেকে নিক্ষিপ্তগুলি তার নীচের চোয়াল উড়িয়ে দিয়েছিলো, ফলে বিলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তার সে অস্ত্র তখন হয়ে পড়েছিলো অকেজো। কিন্তু দাঁতই ভালুকের একমাত্র অস্ত্র নয়। তাই বিলির শরীরকে ছিন্নভিন্ন করতে নিয়োজিত হল ভল্লুকীর মারাত্মক নখরযুক্ত থাবা। পাথরের মত কঠিন উইঢিবি যে নখের আঘাতে নরম মাটির স্তূপে পরিণত হয়, মানবদেহের পরিণতি সেই সারিবদ্ধ কৃপাণের সান্নিধ্যে এলে কি হতে পারে তার ধারণা সম্ভবতঃ বিলির চিন্তাতেও এসেছিলো, তাই তার শক্তিশালী দুই পায়ের নিপুণ প্রয়োগকৌশলে ভল্লুকীর পিছনের পা এবং থাবা দু'টোকে সে করে দিয়েছিলো সম্পূর্ণ অকেজো। অন্যদিকে, শত্রুর মুখের তলায় নিজের বাঁ-হাতটাকে এক অদ্ভুত কৌশলে স্থাপন করে সে ভল্লুকীর মুখে, পাঁজরে এবং অন্যান্য দুর্বলস্থানে অবিশ্রান্তভাবে প্রয়োগ করে চলেছিল তার মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ

হস্তের শক্তিশালী মুষ্টিযোগ। সেই সঙ্গে উপযুক্ত সংগতে তার মুখ থেকে অবিরাম নির্গত হচ্ছিল ইংরাজী, স্কচ এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় যাবতীয় অকথ্য গালিগালাজ।

ইংলিশ সাহেব বিলির এই অদ্ভুত আচরণে স্থান-কাল ভুলে হেসে উঠলেন হো হো করে। যুদ্ধরত বিলির কানেও সম্ভবতঃ সেই হাস্যধ্বনি গেছিল; কারণ, মুহূর্তের জন্য সে গালাগালি দেওয়া বন্ধ করলো। তারপর আবার শুরু করল অবিরাম ধারায়, এবং এবারের লক্ষ্য আর কেউ নয়, স্বয়ং জেম্‌স্‌ ইংলিশ। বলা বাহুল্য, বিলির উচ্চারিত শব্দগুলি একজন ভদ্রলোকের পক্ষে আদৌ সম্মানজনক ছিল না, ফলে অচিরেই জেম্‌স্‌ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন।

ক্রমাগত গড়াতে গড়াতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহ এগিয়ে চলেছিল নিকটবর্তী একটা খাদের দিকে। আর মাত্র যখন ফুটকয়েকের ব্যবধান, এমন সময় স্থানীয় জেলা জজের আক্ষেপ-উক্তিতে স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান শিকারীদের যেন সম্বিত ফিরলো। —"হায় ভগবান! ওর বাঁচার কোন উপায় নেই।" একই সঙ্গে ইংলিশ সাহেবের সতর্কবাণীও উচ্চারিত হল বিলির উদ্দেশ্যে। কিন্তু আর মাত্র একটি পাক। তারপরই ভল্লুকী ও বিলির আলিঙ্গনাবদ্ধ দেহ অদৃশ্য হল খাদের গহ্বরে। উপর থেকে শিকারীরা দেখলেন বিদ্যুদ্বেগে শূন্যে অবতরণশীল একটি কালো বস্তু খাদের গায়ে একটি প্রস্তরখণ্ডে সজোরে ধাক্কা খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গভীরতর শূন্যতায়।

সবাই নির্বাক, বিমূঢ়, স্তম্ভিত! ঘটনার করুণ পরিণতি সবাইকে কেমন যেন অসুস্থ করে তুলেছিল। বিশেষতঃ মিঃ ইংলিশ মনে মনে নিজেকেই দায়ী করেছিলেন এই বিয়োগান্ত পরিণতির জন্য। কেন যে তিনি বিলিকে সঙ্গে আনতে গেলেন; তখন যদি তিনি এই ধরনের ঘটনার কোন রকম পূর্বাভাষ পেতেন, তাহলে আজকে হয়ত তাঁকে এই নির্মম মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে থাকতে হতো না। বিবেকের কাছে নিজেকে এখন বারবারই তাঁর অপরাধী বোধ হতে লাগলো।

অস্বস্তিকর এই নীরবতাকে প্রথমে কাটিয়ে উঠলেন জনৈক শ্বেতাঙ্গ, বললেন, —"যাক্‌, যা হওয়ার তা হয়েছে। এখন আমাদের বোধহয় উচিত হবে, বিলির দেহটার সন্ধান করা।" কথার বাস্তবতা ও যুক্তি অনস্বীকার্য। উপরন্তু বর্তমান পরিবেশটাকে পাল্টানোর প্রয়োজন সকলেই বোধ করছিলেন। সুতরাং, বিলির দেহ অনুসন্ধান করতে খাদের নীচে যাওয়াই সাব্যস্ত হল।

দুর্গম পাহাড়ী পথ নেমে গিয়েছে নীচের দিকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পথের

নিশানা হয়েছে অদৃশ্য। সেখানে অবলম্বন শুধু ঘাসের চাপড়া অথবা পাথরের খাঁজ। তারই মধ্যে শিকারীরা হরিণের পায়ে চলার একটা পথ খুঁজে বের করলেন। কিন্তু এই পথ ধরে কিছুটা নামার পরই স্থানীয় জেলা জজ এবং কলকাতাবাসী ব্যারিস্টারগণ উপলব্ধি করলেন যে, এই বন্ধুর ভ্রমণে ইস্তফা দিয়ে আপাততঃ আপন আপন পৈতৃক প্রাণরক্ষায় সচেষ্ট হলে হয়ত ভবিষ্যতে আরও অনেক লোকহিতকর কাজ করার সুযোগ পাওয়া যাবে। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই অভিযাত্রীদলের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়াল দুই-এ। অবশিষ্ট রইলেন কেবলমাত্র শিকারী ইংলিশ সাহেব এবং তাঁর সহযোগী বন্ধু "সি-"। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল যে, ঐ "সি-" নামেই ইংলিশ সাহেব আমাদের কাছে তাঁর বন্ধুর পরিচয় দিয়েছেন।

বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করার পর শিকারী দু'জন সামান্য বিশ্রামের জন্য একটি সমতল পাথরের উপর এসে দাঁড়ালেন। এমন সময়ে, অকস্মাৎ তাঁদের কর্ণেন্দ্রিয়কে স্পর্শ করল এক ক্ষীণ সঙ্গীতধ্বনি—

"টোয়েনকে ডিড্‌ল্‌ ওঃ! টোয়েনকে ডিড্‌ল্‌ ওঃ ......"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন দু'জনে। ভুল শুনছেন না তো তাঁরা! এ কী করে সম্ভব !! অত উঁচু থেকে পাথরের উপর ছিটকে পড়ে মানুষ তো দূরের কথা, কোন পার্থিব প্রাণীর পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, সুতরাং—, কিন্তু ঐ তো! ঐ যে আবার সেই কণ্ঠস্বর, এবার আরও স্পষ্ট, আরও জোরালো। পথের শেষ বাঁকটুকু ঘুরতেই চোখ-কানের বিবাদ মিটলো। এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! ভল্লুকীর তালগোল পাকানো বিশাল মৃতদেহের উপর জাঁকিয়ে বসে গান ধরেছে বিলি প্যারোট—"টোয়েনকে ডিড্‌ল্‌ ওঃ! ......"

বিলির দেহ ছিল প্রায় অক্ষত। শুধু মল্লযুদ্ধের সময় ভালুকের মারাত্মক নখ তাঁর কাঁধে ও বাহুতে এঁকে দিয়েছিল কয়েকটি গভীর ক্ষতচিহ্ন। এছাড়া জানুর কাছে অপর একটি দীর্ঘ ক্ষতও অবিরাম রক্তক্ষরণ ঘটাচ্ছিল।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর বিলিকে ব্র্যাণ্ডি এবং দুধ খাইয়ে দেওয়া হল।

পরে বিলির মুখেই শোনা গেল তার এই আশ্চর্য পরিত্রাণের কাহিনী—

প্রচণ্ড বেগে খাদের মধ্যে পড়ার সময় ভল্লুকীর দেহ প্রথমে পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং মাটিও প্রথমে স্পর্শ করে। ফলে, ভাল্লুকীর দেহসংলগ্ন বিলি রক্ষা পেয়ে যায় অভাবিতভাবে।